এ কি অপরূপ

A KI APARUP

SAILAJANANDA MUKHOPADHAYA

Price Rs. 4·00

এ কি অপরূপ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

টি. এস. বি. প্রকাশন
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র
অভিন্নহৃদয়েষু—

প্রেমেন,

আমার এ-বই লেখা তোমারই
অনুরোধে, তোমাকেই দিলাম।

—শৈলজানন্দ

॥ এক ॥

বিশু আবার পালিয়েছে।

এবার পালিয়েছে কালাপানি পেরিয়ে সোজা আন্দামানে।

আন্দামান থেকে একখানা চিঠি লিখেছে তার দিদিকে। একখানি পোষ্টকার্ডে মাত্র কয়েকটি লাইন।—'ছোট্‌দি, তুমি ভেবো না। আমি আন্দামানে চলে এসেছি। অমরদাকে বোলো—আপাততঃ কিছুদিন তাকে আমি বিরক্ত করব না। কাজকর্ম কিছু যদি যোগাড় করতে পারি তো এইখানেই রয়ে যাব। না পারি তো আবার ফিরে যাব কলকাতায়। তখন দেখা হবে।'

বাস্, এই পর্যন্ত।

শীলা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছিল। চিঠিখানা পিওন তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল।

বান্ধবী জিজ্ঞাসা করেছিল, মিডওয়াইফারি নার্সিং সবই তো পাশ করলি। এবার কি করবি ভেবেছিস?

জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় চিঠির দিকে নজর পড়লো শীলার। জবাব আর দেওয়া হলো না। চিঠিখানা চট্ করে পড়ে নিয়েই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে।

—কার চিঠি?

শীলার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। সুন্দর চোখ দুটি তুলে তাকালো একবার মাধবীর দিকে। মাধবী তার চোখ দেখেই বুঝতে পারলে ব্যাপারটা তেমন সুবিধের নয়। চোখের কোণে জল এসে গেছে।

মাধবী বললে, আবার দেখা হবে। আজ চলি।

বলেই সে চলে গেল।

শীলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর চিঠিখানা হাতে নিয়েই সে বাড়ীতে ঢুকলো।

শহরের উপকণ্ঠে পাইক্‌পাড়া অঞ্চলে ছোট্ট একখানি একতলা বাড়ী।

সামনের ঘরের পর্দা সরিয়ে শীলা একরকম ঢুকেই পড়েছিল ভেতরে। ঢুকেই দেখে, অমরনাথ কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। তক্ষুনি পর্দাটা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসছিল শীলা।

অমরনাথ নিজেই ডেকে কথা বললেন।—শীলা!

আবার পর্দা সরিয়ে শীলাকে মুখ বাড়াতে হলো।

—এ আমার ছাত্র। পরিতোষ।

—আমি ভেবেছিলুম—রুগী-টুগী হবে হয়ত'।

বলতে বলতে শীলা ঘরে ঢুকলো। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখলে মানুষটিকে। সাহেবী পোষাকপরা প্রিয় দর্শন এক যুবক।

অমরনাথ হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ রুগীও বলতে পারো। মেরিন্ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। কিন্তু বলছে—অশান্ত সমুদ্রের ওপর জাহাজ যখন খুব দুলতে থাকে তখন ওর শরীর খারাপ হয়, মাথা ঘোরে, গা বমি-বমি করে। তাই চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করতে এসেছে—আমার হোমিওপ্যাথিতে তার কোনও ওষুধ আছে কিনা!

শীলা বললে, তোমার হোমিওপ্যাথির খবর তাহ'লে উনিও পেয়েছেন!

পরিতোষ বললে, উনি যখন কলেজের প্রফেসার, তখন থেকেই তো আমরা জানি।

—আরে, তখন তো সবে স্থুরু! শোনো তবে কেমন করে স্থুরু হলো।

এই বলে অমরনাথ তাঁর হোমিওপ্যাথির গল্প বলতে যাচ্ছিলেন। শীলা সে-গল্প অনেকবার শুনেছে। একবার আরম্ভ হলে আর শেষ

হতে চায় না।

শীলা বললে, আমি চললাম।

—যাবে কেন? বোসো।

—আসছি। তুমি তোমার গল্প বল।

এই বলে চিঠিখানা হাতে নিয়েই শীলা চলে যাচ্ছিল, অমরনাথ বললেন, তাহ'লে আমাদের জন্যে দু'পেয়ালা চা এনে দাও।

—দিচ্ছি।

শীলা চলে গেল।

অমরনাথ আরম্ভ করলেন তাঁর হোমিওপ্যাথির গল্প।

কিন্তু হোমিওপ্যাথির গল্প বলতে হলেই এমন একটা কথা তাঁকে বলতে হয়—যে-কথাটা ছাত্রের সুমুখে সব সময় বলা চলে না। একটু লজ্জা-লজ্জা করে।

কিন্তু সেরকম লজ্জার বালাই আর-যারই থাক্ অমরনাথের নেই। তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে বললেন তাঁর প্রেমের কাহিনী।

বললেন, গিয়েছিলাম এক বিয়ে বাড়ীতে। সেখানেই লীলার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। চোখে-চোখে দেখা শুধু। সেরকম দেখা তো কত দেখেছি কত মেয়েকে। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে যে-শিহরণ জেগেছিল আমার সমস্ত শরীরে আর মনে, সেরকমটি কখনও হয়নি। সে যে কী, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। কথা রেখে একটা কথা বলছি। তুমি বিয়ে করেছ?

পরিতোষ বললে, আজ্ঞে না।

অমরনাথ বললেন, তাহ'লে বলে রাখি শোনো! যৌবনের একটা নেশা আছে, যেটাকে আমরা উন্মাদনা বলে থাকি। সেই সময় যুবতী মেয়েদের দেখলে হয়ত একটা আকর্ষণ অনুভব করবে। সেটাকে যেন ভালবাসা বলে ভুল কোরো না। যে মেয়েকে তুমি ভালবাসতে পারবে না, প্রথম দেখবামাত্র তাকে তোমার ভাল লাগবে না—তাকে যেন বিয়ে করে বোসো না। তারপর শোনো!

সংক্ষেপে বলি। লীলার সঙ্গে পরিচয় হলো। বি,এ বি,টি পাশ। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। আমিও অধ্যাপক। পাত্র হিসাবেও নেহাৎ কুপাত্র নই। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হলো, কথাটা তাকে একদিন বলেই ফেললাম। লীলা হেসে বললে, বিয়ের কথা তুমি একদিন বলবে তা আমি জানি।

—কেমন করে জানলে?

লীলা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করলে, তোমার সঙ্গে যে-মুহূর্তে আমার চোখাচোখি দেখা হয়েছে, সে-মুহূর্তের কথা ভুলতে পারব না। ইলেকট্রিকের শক্ লাগলে যেমন হয় ঠিক তেমনি হয়েছিল।

—আমার কথাটা আমি কিন্তু তখনও তাকে বলিনি।

লীলা বললে, কিন্তু বিয়ে আমি করি কেমন করে? বাবা মারা যাবার পর ছোট একটি বোন আর একটি ভাইকে মানুষ করতে হচ্ছে। তাদের বোঝা নিয়ে তোমার ঘাড়ে আমি চড়বো না।

—আমি কিন্তু একেবারে একা। বাবা নেই, মা নেই, ব্যাঙ্কে তিরিশ হাজার টাকা, তার ওপর কলেজের অধ্যাপক। চাকরিটা তখন সবে পেয়েছি। লীলার কোনও কথাই শুনলাম না। বিয়ে করে সংসারী হলাম।

পরিতোষ বললে, তাঁর সেই ছোট বোন আর ছোট ভাই?

অমরনাথ বললেন, তারা আর ছোট নেই, মস্ত বড় হয়েছে। বোনটিকে তো দেখলে। ওই যে এসেছিল—ওই শীলাই তার ছোট বোন। আর ছোট ভাই বিশ্বনাথ। ছোঁড়াটাকে মানুষ করতে পারলাম না কিছুতেই। লেখাপড়াও করলে না, সভ্যভব্যও হলো না। মাসখানেক হলো কোথায় পালিয়েছে—খোঁজখবর কিছুই পাচ্ছি না।

—খোঁজ পেয়েছি। বিশু চিঠি লিখেছে।

বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো শীলা। চায়ের ট্রেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে বললে, সেই কথাটাই তখন বলতে এসেছিলাম।

তোমার হোমিওপ্যাথির গল্প শেষ হলো ?

অমরনাথ বললেন, এখনও আরম্ভই হয়নি।

ট্রে থেকে বিস্কুটের প্লেটটা তুলে নিয়ে পরিতোষের হাতের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে শীলা বললে, আজে-বাজে এত বকতেও পারো তুমি !

অমরনাথ বললেন, শাসন করিসনে, থাম। তোর দিদি আমাকে কোনদিন শাসন করেনি।

শীলা মাথা হেঁট করে চা তৈরি করতে লাগলো।

অমরনাথ বললেন, প্রফেসারি করতে গিয়ে আমার এই অভ্যাসটি হলো। বুঝলে পরিতোষ, প্রফেসাররা আর কিছু না শিখুক্, ভাল বক্‌তে শেখে।

এই বলে হো হো করে হেসে নিলেন তিনি। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, এইবার হোমিওপ্যাথির কথাটা—

—থাক্। বলে শীলা তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তার চেয়ে তোমরা চা খাও। হোমিওপ্যাথির গল্পটা আমি বলে দিচ্ছি।

শীলা হাঁসতে লাগল।

পরিতোষ একটি বিস্কুট হাতে নিয়ে তাকিয়ে রইলো শীলার মুখের দিকে। মনে হলো, সে রকম হাসি যেন সে কখনও দেখেনি।

শীলা কিন্তু একবার তাকিয়েই চোখটা নামিয়ে নিলে। বললে, আমাদের বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। দিদি ছিল হোমিওপ্যাথির ভক্ত। আর এখানে এসে দেখে, জামাইবাবু হোমিওপ্যাথির নাম শুনলে চটে যায়। বলে, হোমিওপ্যাথি আবার ওষুধ নাকি ? জল। সেইটে বলব ? সেই যে সেই হাজার ডাইলিউসন, লাখ ডাইলিউসন ?

—বল্, তোর যা খুশী তাই বল্ !

অমরনাথ চা খেতে লাগলেন।

শীলা বললে, জামাইবাবু বলতো, হরিদ্বারের গঙ্গায় এক ড্রাম

হোমিওপ্যাথি ওষুধ ফেলে দিয়ে কলকাতার গঙ্গা থেকে এক ড্রাম জল তুলে নিলেই এক লাখ ডাইলিউসনের ওষুধ হয়ে যাবে। দিদি যত রাগতো জামাইবাবু তত বলতো। শেষে একদিন জামাই-বাবুর বাঁহাতে হলো সাংঘাতিক বেদনা। কন্ কন্ করে হাত যেন খসে যেতে লাগলো। প্রথমে ছোট-খাটো ডাক্তার, তারপর বড় বড় ডাক্তার। কেউ আর বাকি রইলো না।

পরিতোষ বলে উঠলো, হোমিওপ্যাথ?

—পাগল হয়েছেন? জামাইবাবু হোমিওপ্যাথ দেখাবে? সব এ্যালাপ্যাথ। বছর ঘুরে গেল। অসুখ আর সারে না! দিন কতক ভাল থাকে, আবার হয়। বাঁ হাত থেকে ডান হাতে তারপর পায়ে নামলো বেদনা। তারপর আবার উঠলো হাতে। এমনি করে কখনও পায়ে, কখনও হাতে। বেদনাটা গা-সওয়া হয়ে গেল। এমনদিনে দিদি পড়লো অসুখে। দিদির ইচ্ছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হয়, কিন্তু জামাইবাবুর ভয়ে কিছু বলতে পারে না। চিকিৎসাও চলতে লাগলো, অসুখও বাড়তে লাগলো। একটা অসুখ সারে, মাস দুয়েক বেশ ভাল থাকে, আবার 'আর-একটা অসুখ হয়। শেষে দিদি যখন কঙ্কালসার হয়ে গেল, বিছানা থেকে আর উঠতে পারলে না, তখন এলেন একজন হোমিওপ্যাথ। দিদির শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করলে জামাইবাবু। দিদি তখন যন্ত্রণায় দিবারাত্রি ছটফট্ করে, এ্যালাপ্যাথ ডাক্তার এসে মরফিয়া ইঞ্জেকসান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যায়। হোমিওপ্যাথ এসেই বললেন, মরফিয়া দেওয়া চলবে না।

জামাইবাবু জিজ্ঞাসা করলে, ওর যন্ত্রণার কি হবে?

ডাক্তারবাবু বললেন, যন্ত্রণা ভাল হয়ে যাবে।

সত্যিই ভাল হয়ে গেল। তিনদিন পরে দিদি উঠে বসলো বিছানায়। আমরা ভাবলাম দিদি সেরে উঠলো। কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন, আমাকে যদি কিছুদিন আগে ডাকতেন, হয়ত-বা কিছু

করতে পারতাম, কিন্তু এখন আর কোনও আশা নেই। তবে জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু হবে না—এইটুকুমাত্র বলতে পারি। শেষ পর্য্যন্ত তিনি যা বলেছিলেন তাই হলো। ছ'মাস পরে দিদি মারা গেল। তবে শেষ দিন পর্য্যন্ত কোন যন্ত্রণা তার হয়নি।

পরিতোষ বললে, হোমিওপ্যাথি তাহ'লে ভাল?

অমরনাথ বললেন, শুধু ভাল নয়, আশ্চর্য্য।

—তাহ'লে হোমিওপ্যাথির এত দুর্ণাম কেন? পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে।

অমরনাথ বললেন, ভাল ডাক্তারের সংখ্যা খুব কম বলে।

শীলা বললে, তার চেয়ে বলুন—খারাপ ডাক্তারের সংখ্যা খুব বেশি বলে।

শীলা খুব ভাল কথা বলেছে। পরিতোষ তার মুখের দিকে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ে গেল। শীলা চোখ নামিয়ে নিলে, কিন্তু পরিতোষ তার চোখ ফেরাতে পারলে না। জানলার পথে একটুখানি রৌদ্র এসে পড়েছিল শীলার শাড়ীর ওপর। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। কিন্তু শুধু শুধু এমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ভাল দেখায় না। যাহোক কিছু বলা দরকার।

পরিতোষ বললে, তারপর থেকেই আপনার জামাইবাবু বুঝি হোমিওপ্যাথির ভক্ত হয়ে উঠলেন?

শীলা মুখ তুললে। সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, না। ওঁর নিজের হাতের বেদনা তখনও ঠিক সারেনি। ডাক্তার-বাবুকে বলতেই তিনি একটিমাত্র ওষুধ দিলেন। তাইতে হাতের বেদনা যখন একেবারে ভাল হয়ে গেল, তখন দেখলাম উনি একটি একটি করে বই কিনে আনছেন আর লুকিয়ে লুকিয়ে রাত জেগে জেগে পড়ছেন।

অমরনাথ এতক্ষণ পরে কথা বললেন। —তোমার দিদি কি বলে গেছে—কই সে-কথা তো বললে না?

শীলার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি চাপা হাসি ফুটে উঠলো। বললে, তুমি বল।

তারপর কাপ ডিসগুলো ট্রের ওপর বসিয়ে সে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে পরিতোষের দিকে একবার তাকিয়েই ট্রেটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনে হলো যেন পালালো।

পালাবার কারণটা আর কেউ না বুঝুক্, অমরনাথ বুঝলেন।

বললেন, কেন পালিয়ে গেল বুঝলে পরিতোষ?

কেন জানি না পরিতোষ একটু লজ্জিত হয়ে উঠলো। মাথা হেঁট করে বললে, আজ্ঞে না।

অমরনাথ বললেন, ওর দিদি মারা যাবার আগে আমাকে তুটি অনুরোধ করেছিল। প্রথম অনুরোধ—আমার এই হাতের বেদনার চিকিৎসা যেন আমি ওই হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে দিয়েই করাই, আর দ্বিতীয় অনুরোধ—শীলাকে যেন নিজের কাছেই রাখি।

পরিতোষ বললে, তুটো অনুরোধই তো রক্ষা করেছেন আপনি।

—প্রথমটা করেছি। কিন্তু দ্বিতীয়টা করিনি।

—তার মানে? পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, শীলা কি আপনার এখানে থাকে না?

অমরনাথ বললেন, থাকে। কিন্তু কাছে রাখবার মানেটা তুমি ঠিক ধরতে পারনি। কাছে রাখতে বলেছিল মানে বিয়ে করতে বলেছিল।

পরিতোষ বললে, করে ফেলুন!

বলেই সে তার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, আমার সেই ওষুধটা লিখে দিন। আমি চলি।

কাগজ কলম সবই ছিল হাতের কাছে। অমরনাথ ওষুধের নামটা লিখতে লিখতে বললেন, ভাল দোকান থেকে কিনবে। জাহাজে যেতে যেতে যদি মনে হয় শরীরটা তুর্বল মনে হচ্ছে, মাথা

ঘুরছে, গা বিরোচ্ছে, চারটে ছোট ছোট গ্লোবিউল মুখে ফেলে দেবে।

কাগজটি হাতে নিয়ে পরিতোষ উঠে দাঁড়ালো। শীলা যেদিক দিয়ে চলে গেছে সেইদিকে একবার আড়চোখে তাকালে, তারপর হেঁট হয়ে অমরনাথের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অমরনাথ ডাকলেন, শীলা! শীলা!

রান্নাঘরে ঠাকুরকে কি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল শীলা। ডাক শুনে তক্ষুনি ছুটে এসে ঘরে ঢুকেই দেখে, পরিতোষ নেই।

—চলে গেছেন?

কথাটা এমনভাবে বললে, মনে হলো যেন তার কতই-না প্রয়োজন ছিল তার সঙ্গে।

অমরনাথ বললেন, হ্যাঁ, চলে গেল। কেন?

—কিছু না।

বিষণ্ণ মুখে শীলা এগিয়ে এলো তাঁর টেবিলের কাছে। দেখলে অমরনাথ আবার তাঁর হোমিওপ্যাথি বই খুলে বসেছেন। একাগ্র তন্ময় হয়ে ডুবে গেছেন মহাসমুদ্রে। কী রত্ন আহরণ করছেন তিনিই জানেন। ভুলে গেছেন সব-কিছু। ভুলে গেছেন এইমাত্র তিনি ডেকেছিলেন শীলাকে।

বিশুর চিঠিখানা শীলার সঙ্গেই ছিল। জামার তলায় হাত ঢুকিয়ে বের করলে পোষ্টকার্ডখানা।

কিন্তু কি হবে এই মানুষটিকে খবরটা জানিয়ে?

তবু না জানিয়ে পারলে না।

চিঠিখানি ধীরে ধীরে তাঁর খোলা বই-এর পাতার ওপর নামিয়ে দিয়ে বললে, পড়।

ধ্যান ভেঙ্গে গেল অমরনাথের। চোখ তুলে তাকালেন শীলার দিকে। বললেন, ওষুধটা চট্ করে লিখে দিলাম পরিতোষকে।

দিয়েই মনে হলো একবার মিলিয়ে দেখি—ঠিক দিয়েছি কিনা! ঠিকই দিয়েছি। একটা লতানে গাছের শুকনো ফল থেকে টিঞ্চার তৈরী হয়। লতাটা পাওয়া গেছে মালয় দ্বীপ থেকে।

শীলা তাঁকে আর বেশি কিছু বলতে দিলে না। আঙুল বাড়িয়ে চিঠিখানা দেখিয়ে দিয়ে বললে, আর একটা দ্বীপের খবর আছে এতে। পড়ে ছ্যাখো।

—ও হ্যাঁ, এই চিঠিখানার জন্যেই ডাকছিলাম তোমাকে।

বিশুর চিঠিখানা অমরনাথ পড়লেন ভাল করে।

—একেবারে আন্দামানে গিয়ে উঠলো? দ্বীপান্তরের দেশে?

—আন্দামান এখন আর দ্বীপান্তরের দেশ নয় জামাইবাবু। সেলুলার জেল এখন শুনেছি হাসপাতালের গুদোম হয়েছে।

—কোথায় শুনলে এ-সব বাজে কথা?

শীলা বললে, আমাদের সঙ্গে আন্দামানের একটি মেয়ে পড়তো। তার কাছে অনেক গল্প শুনেছি আন্দামানের।

—উদ্বাস্তুদের কথা কিছু শুনেছ?

—না।

অমরনাথ বললেন, তাদের দু'চারজনকে আমি খুব ভাল করে চিনি। বংশীদা সেখানে গিয়ে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, কেন যে মরতে এলাম এখানে! আন্দামানে মানুষ বাস করতে পারে না। কিছুদিন বাদেই শুনবে হয়ত' আমরা সপরিবারে মরে গেছি।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, কখন গেছেন তাঁরা?

—দেশ বিভাগের পরেই।

অমরনাথ একটু ভেবে বললেন, মনে হচ্ছে যেন উনিশ শ' পঞ্চাশ সালে।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, তাদের আর কোনও খবর পেয়েছ?

অমরনাথ বললেন, হ্যাঁ, পেয়েছি। এই সেদিনও দেখলাম কি

একটা কাগজে যেন বংশীদার একখানা চিঠি ছাপা হয়েছে। সরকারের অবিচারের কথা লিখেছে।

শীলা বললে, ঠিক আছে। এই ন'দশ বছরেও তাঁরা যখন মরেননি তখন আর মরবেন না।

অমরনাথ সেকথার জবাব দিলেন না। বিশুর চিঠিখানা তুলে নিয়ে আর একবার যেন পড়বার চেষ্টা করলেন।

—'ছোট্‌দি, তুমি ভেবো না।' অমরদা যে ভাবতে পারে সেকথা তার মনেও হয়নি। শুধু লিখেছে—'অমরদাকে বোলো, আপাততঃ কিছুদিন তাকে আমি বিরক্ত করব না।' হ্যাঁ, বিরক্ত আমি হয়েছিলাম! কখনও যাকে তিরস্কার করিনি, সেদিন তাকে আমি তিরস্কার করেছিলাম। আমার সঙ্গে বিশুর সম্বন্ধ হয়েছিল শুধু টাকার। প্রথমে চাইতো একটা টাকা, তারপর হলো দু'টাকা, তারপর পাঁচ টাকা, তারপর যেদিন একসঙ্গে দশ টাকা চাইলে সেইদিন আমি বলেছিলাম—অত টাকা কি করবি? জবাব দিয়েছিল—সে খবরে তোমার কি দরকার? টাকা তুমি দেবে কিনা বল। আমি রাগ করে বলেছিলাম—টাকা দেবো না। আরও কি যেন সব বলেছিলাম। সেই রাগে সে পালিয়ে গেল।

তারপর চিঠিখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অমরনাথ যেন আপনমনেই বলতে লাগলেন: আমার কাছে থেকে এত সুযোগ-সুবিধা পেয়েও ছেলেটা লেখাপড়া শিখলে না। তোমার দিদির সঙ্গে প্রথম যেদিন এলে তোমরা, সেই দিনটির কথা আমার মনে পড়ছে। বিশু হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ পরে ঘুরে বেড়াতো, আর তুমি তখন ফ্রক্‌ ছেড়ে সবে শাড়ি পরতে শিখেছো।...বিশুর চরিত্রে এই নিষ্ঠুরতা কেন এলো—এক একসময় সেই কথাই ভাবি। বাপ-মায়ের স্নেহ-ভালবাসা পায়নি, তার ওপর দিদিটা গেল মরে।

শীলা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল। অমরনাথের চোখ ছিল নীচের দিকে। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,

যাক্ আর ভাবতে পারি না।

এই বলে চিঠিখানা তিনি শীলার হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্যে চোখ তুললেন। শীলা চমকে উঠলো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। এই মানুষটির চোখে সে জল কোনোদিন দেখেনি। আজ দেখলে, অমরনাথের দুটি চোখ জলে টলটল করছে।

শীলা কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। চিঠিখানা নিয়েই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিশুকে যে একখানা চিঠি লিখবে তারও উপায় নেই। হতভাগা তার ঠিকানাটাও জানায়নি।

শীলা ভাবলে, হয়ত তার কোন ঠিকানাই নেই। হয়তো বা সেই অজানা দ্বীপে, অপরিচিত লোকজনের একটুখানি সহানুভূতির আশায় পথে পথে এখনও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জায়গাটা কেমন কিছুই সে জানে না। কেমন করে গেল তাও সে বুঝতে পারছে না। মানচিত্রে দেখেছে—ভারতবর্ষের দক্ষিণে সাগরজলে-ঘেরা বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপের নাম—আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ঘন অরণ্যবেষ্টিত শ্বাপদসঙ্কুল সে জায়গাটা নিশ্চয়ই ভয়াবহ। আর শুধু সেইজন্যই বোধ করি যে-সব দুর্দান্ত নরপশুকে চরম শাস্তি দেবার প্রয়োজন হতো ইংরাজেরা তাদের এই দ্বীপের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে আসতো। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের উপযুক্ত স্থান বলে এই জায়গাটাই তারা পছন্দ করেছিল। আন্দামানের যে-মেয়েটি তার সঙ্গে পড়তো, সে হয়ত' মিথ্যা বলেছে। আন্দামানে হয়ত' তার বাড়ীই নয়। হয়ত'-বা জামাইবাবুর উদ্বাস্তু বন্ধু বংশীদা'র কথাই সত্য। হয়ত'-বা আন্দামান মনুষ্যবাসের অযোগ্য।

আন্দামানের সহপাঠিনী বান্ধবী গৌরী আই-এস-সি পাশ করে দিল্লী চলে গেছে। নইলে এক্ষুনি হয়ত' সে তারই কাছে ছুটে যেতো।

বিশুর চিঠিখানা হাতে নিয়ে শীলা তার ঘরে গিয়ে দোরটা বন্ধ

করে দিলে। লুকিয়ে লুকিয়ে খানিকটা কাঁদলে। তারপর স্নান করে খেয়ে দেয়ে রোজ যেমন বেরিয়ে যায়, সেদিনও তেমনি বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

নার্সিং পাশ করবার পর থেকে শীলা রোজই এমনি বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, কি করে, অমরনাথ কোনোদিন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। উপরি উপরি দু'দিন যখন সে একটু রাত করে বাড়ী ঢুকলো, তিন দিনের দিন অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ শীলা ?

শীলা একটু হেসে বললে, তবু ভাল যে জিজ্ঞাসা করলে !

—ফিরতে রোজ রাত্রির হচ্ছে, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

—তাতে তোমার কিছু এসে যায় ?

অমরনাথ বললেন, না। আমার কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

এই বলে রাগ করেই বোধ করি তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

দোরের কাছ থেকে শীলা ফিরে এলো। খোলা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলে, অমরনাথ চোখ বুজে ইজি চেয়ারের ওপর শুয়ে পড়েছেন।

—রাগ করলে ?

কোনও জবাব দিলেন না অমরনাথ।

শীলাকে ঘরে ঢুকতেই হলো।

—কথা কইছ না যে ?

অমরনাথ বললেন, যেখানে যাচ্ছ যাও।

জবাবটা চট্ করে দিতে পারলে না শীলা। একটু থেমে কেমন যেন একটু ইতঃস্তত করে বললে, যে কথা ভাবছো তা নয়। সে ভয় তোমার নেই।

—থাকলেই বা কি করছি। একজন চলে গেছে, আর একজন যদি চলেই যায়......

কথাটা শেষ হবার আগেই শীলা বলে উঠলো, যেতেই যদি হয়,

তোমাকে না জানিয়ে যাব না।

বলেই সে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল।

সেদিনও তেমনি রাত করেই ঘরে ঢুকলো শীলা।

শীতের রাত। বোধ করি পৌষ মাস। তখনও এগারোটা বাজেনি। তবু মনে হচ্ছিল যেন কতই না রাত হয়েছে।

আকাশে চাঁদ ছিল। রাস্তায় ছিল চাঁদের আলো, আর ছিল কুয়াশার মত ধোঁয়া।

বাসটা রোজ যেমন দাঁড়ায়, সেদিনও তেমনি দাঁড়িয়েছিল বড় রাস্তার ধারে। রোজ যেমন হেঁটে হেঁটে আসে সেদিনও তেমনি হেঁটে হেঁটেই আসছিল বাস থেকে নেমে। রাস্তাটা গলি-রাস্তা নয়, বড় রাস্তার মতই চওড়া রাস্তা। বাড়ীর কাছাকাছি এসে সেদিন কী যে হলো, আচম্‌কা ল্যাম্প পোষ্টের দিকে তাকাতেই গা'টা ছম্‌ করে উঠলো। মনে হলো অন্ধকার গলির মুখে লম্বা একটা লোক যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীলাও দাঁড়িয়ে পড়লো। পাশের বাড়ীর আধখোলা জানলার পথে এক চিল্‌তে আলো এসে পড়েছিল ল্যাম্প পোষ্টের গায়ে। তার ছায়ায় আর আব্‌ছা ধোঁয়ায় এই রহস্যের সৃষ্টি করেছিল বোধ হয়। শীলা আপনমনেই একটু হাসলে। কারও দোষ নেই। তার মনের ছায়া পড়েছিল ওই ছায়া মূর্ত্তির ওপর।

হাসতে হাসতেই দরজার কড়া নাড়লে শীলা।

পাঁচু এসে দরজা খুলে দিলে।

—ঠাকুর এখনও যায় নি?

—না দিদিমণি।

—বাবু খেয়েছেন?

পাঁচু বললে, না।

বলবার দরকার ছিল না। ঘরে আলো জ্বলছে। জানলার

পথে উঁকি মেরে দেখলে, অমরনাথ তার হোমিওপ্যাথি বই নিয়ে তন্ময় হয়ে বসে আছেন।

—এখনও খাওনি যে ?

—খুব সময়ে এসে পড়েছ। আর একটু হলেই খেয়ে ফেলতাম।

খিল খিল করে হেসে উঠলো শীলা।

হাসিটা কেমন যেন বিদ্রুপের মত শোনালো অমরনাথের কাছে।

—ঠাকুর, বাবুকে খেতে দাও—বলতে বলতে শীলা তার ঘরের দিকে চলে গেল।

কাপড় জামা বদলে বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলে খাবার টেবিলের ওপর এসে বসেছেন অমরনাথ। ঠাকুর তাদের দু'জনেরই খাবার ধরে দিয়ে গেছে।

শীলা বললে, তুমি খাও। আমি পরে খাব।

—লজ্জাটা আজকেই যেন বেশি মনে হচ্ছে ?

অমরনাথ শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে হাসছে।

—বোসো।

মনে হলো যেন হুকুম করলেন তিনি।

হুকুম তামিল করতে দেরি হলো না শীলার।

—খাও।

—এই তো বসেছি।

—না, শুধু বসলে হবে না। খেতে হবে।

হাসতে হাসতে শীলা খেতে বসলো।

—খুব যে হাসি দেখছি। দিগ্বিজয় করে এলে মনে হচ্ছে !

শীলা বললে, এখনও করিনি।

—করে ফ্যালো। দেরি করছ কেন ?

—তোমার একটু সাহায্য চাই।

—আমার সাহায্য ?

একটু অবাক হয়ে গেলেন অমরনাথ। বললেন, বল কি করতে হবে আমাকে ?

শীলা বললে, বলতে লজ্জা করছে।

—ভাবছো আমি সহ্য করতে পারবো না ? খুব পারব, তুমি বল।

—না তোমার খাওয়া হোক্, তারপর বলবো।

—খাওয়া আমি বন্ধ করে দিলাম। না শুনে খাব না।

অমরনাথ হাত গুটিয়ে বসে রইলেন।

শীলা বললে, তবে বলছি শোনো। কাল আমি দিল্লী যাব। আমার কিছু টাকার দরকার।

হো হো করে হেসে উঠলেন অমরনাথ! —এই কথা! ভেবেছ বুঝি বিশুকে যেমন বলেছিলাম টাকা দেবো না, তোমাকেও যদি তেমনি জবাব দিই ? ছি ছি, এ-কথা তুমি ভাবলে কেমন করে ? কত টাকা ?

—যাওয়া আসার ট্রেণ ভাড়া, আর দু'একটা দিন যদি ওখানে থাকতে হয়! থাকার খরচ অবশ্য লাগবে না।

অনেক কথাই অবশ্য জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল অমরনাথের, কিন্তু তিনি আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না। খাওয়ার পর বললেন, আজ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোওগে যাও। কাল সব ব্যবস্থা করে দেবো।

পরের দিন সবই ব্যবস্থা করে দিলেন অমরনাথ।

সকাল সকাল খেয়ে ট্যাক্সি করে বেরিয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেকের ভেতর ফিরে এলেন হাসতে হাসতে। এসেই ডাকলেন, শীলা!

শীলা কাছে এসে দাঁড়াতেই পকেট থেকে তিনি বের করলেন একখানা প্লেনের রিটার্ন টিকিট। বললেন, দু'খানাই করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু অনুমতি না নিয়ে করতে পারলাম না।

শীলা সেকথার কোনও জবাব দিলে না। শুধু বললে, আমি

চেয়েছিলাম একখানা ট্রেনের টিকিট। তুমি এত খরচ করতে গেলে কেন?

—সে আমার খুশী।

বলেই পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে বললেন, এই থেকে তোমার পছন্দমত গয়না কাপড় কিনে নাওগে।

শীলা দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলের পাশেই। হঠাৎ কী যে তার হলো, মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না, চোখের বড় বড় পাতাদুটি তুলে অমরনাথের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

—একি হচ্ছে? বলেই অমরনাথ উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে শীলাকে বুকের কাছে টেনে এনে বললেন, এতে কাঁদবার কি আছে?

শীলা চট্ করে শক্ত করে নিলে নিজেকে।

—না, কাঁদিনি।

বলেই নিজের কাপড়ের আঁচলটা তুলে চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিলে প্রথমে। তারপর নিজেকে খানিকটা সহজ করে নিয়ে বললে, কিছু না নিলে তুমি দুঃখ করবে তাই নিলাম।

টেবিলের ওপর থেকে একশ' টাকার একখানি নোট আর প্লেনের টিকিটখানা তুলে নিলে শীলা। বললে, যা বলবার ফিরে এসে বলবো। দু'একদিন দেরি হলে ভেবো না।

অমরনাথকে আর-কিছু বলবার অবসর না দিয়েই শীলা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দিল্লী থেকে শীলা ফিরে এলো প্রায় এক সপ্তাহ পরে।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে কোম্পানীর গাড়ী তাকে নামিয়ে দিয়েছিল যশোর রোডের ওপর, ভেবেছিল—এইটুকু তো পথ,

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হেঁটেই যাবে, কিন্তু হাতে ছিল টাকা, মনটা ছিল খুশী-খুশী, তার ওপর ফাঁকা একটা ট্যাক্সি বেরোচ্ছিল পেট্রোল-পাম্পের গেট্ দিয়ে, হাতটা কেমন যেন সে অজান্তেই তুলে ফেললে, গাড়ীটা এসে দাঁড়ালো তার কোল ঘেঁষে, দোরটা খুলে দিয়ে বললে, উঠুন।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই শীলা দেখতে পেয়েছিল তার জামাই-বাবুকে। দোরের পর্দার ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখা যায় ততটুকু দেখেছিল। ভেবেছিল ঘরে ঢুকেই তাকে চমকে দেবে।

কিন্তু অমরনাথই দিলেন তাকে চম্‌কে।

পা টিপে টিপে এসে দোরের পর্দাটা তুলতেই অমরনাথ মুখ না তুলেই বলে উঠলেন, গুড্ মর্ণিং ম্যাডাম!

—ম্যাডাম নয়। মিস্।

বলতে বলতে শীলা হাসি-হাসি মুখে এসে বসলো পাশের চেয়ারটাতে।

—ম্যাডাম নয় কেন?

শীলা বললে, ম্যাডাম আর হলাম কোথায়?

অমরনাথ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন তার সিঁথির দিকে।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখছ অমন করে? সিঁদুর?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি ভেবেছিলে আমি বিয়ে করতে গেছি?

—তা না তো কি জন্যে গিয়েছিলে?

—বলছি। আগে এক পেয়ালা চা খাই। দিল্লীতে যা শীত!

—পাঁচু আমাকে এখনও চা দেয়নি। পাঁচু, দিদিমণি এসেছে। চা আনো।

বলতে বলতেই পাঁচু এলো চা নিয়ে। ট্রের ওপর দুটো পেয়ালা দেখে শীলা জিজ্ঞাসা করলে, আমি এসেছি তুই জানলি কেমন করে?

পাঁচু বললে, দেখলাম যে! বাবু তো রোজই বলছেন—আজ

আসবে আজ আসবে।

অমরনাথ বললেন, দিদিমণির বাথরুমে এক বালতি গরম জল দিয়ে আয়।

পাঁচু বেরিয়ে গেল। শীলা টি-পট থেকে চা ঢালতে লাগলো।

অমরনাথ বললেন, পাঁচুকে সরিয়ে দিয়েছি। নাও বল এবার রাজধানীতে কি জন্যে গিয়েছিলে!

—আর যে-জন্যেই যাই বিয়ে করতে যাইনি।

বলেই চায়ের কাপটা এগিয়ে দিলে তাঁর হাতের কাছে।

—বিয়ে কি তুমি করবে না?

—জানি না। বিয়ের কথা এখন ভাবছি না।

—কি ভাবছো?

—ভাবছি অন্য কথা।

—দিল্লী কি জন্য গিয়েছিলে বলবে?

চা খেতে খেতে শীলা বললে, নিশ্চয়ই বলবো।

—বল। শোনবার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি।

—পরের কথা জানবার জন্যে এত অস্থির হওয়া ভাল নয়।

বলেই সে মুখ তুলে হাসলে। শীলার হাসিটি বড় সুন্দর। মুক্তোর মত দাঁতগুলি দেখা যায়। গালে একটি টোল পড়ে।

অমরনাথ বললেন, পর আর ভাবতে পারছি কই? তবে বলতে যদি ইচ্ছে না হয় তো বোলো না!

শীলা বললে, দিল্লী গিয়েছিলাম একটা চাকরির খোঁজ পেয়ে।

—কিসের চাকরি?

—যে-কাজ শিখলাম সেই তারই চাকরি। হাসপাতালের নার্স। মেট্রনও বলতে পার।

—কোথাকার হাসপাতাল? দিল্লীর?

শীলা তার ব্যাগটা খুলে একতাড়া কাগজ বের করলে। বললে, বল দেখি কোথাকার হাসপাতাল?

—সে বিদ্যা তো শিখিনি, কাজেই বলতে পারব না।

কাগজগুলো শীলা তাঁর হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, ছ্যাখো আমি কিরকম অসাধ্য সাধন করেছি। আন্দামানে চাকরি নিয়েছি।

আন্দামান নামটা শুনেই অমরনাথের কাছে সব-কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুলো না। কাগজ-পত্রগুলো উল্‌টে পাল্‌টে দেখতে লাগলেন।

শীলা বললে, আন্দামান যদিও আমাদেরই দেশ, তবু সেখানে যেতে হলে আন্দামানের চিফ্ কমিশনারের অনুমতি নিতে হয়। জাহাজ তো যায় মাসে দু'বার। চিঠি লিখে অনুমতি নিতে হলে একমাসের ধাক্কা। কাজেই প্রিপেড্ টেলিগ্রাম করতে হলো। ওয়ারলেস্ টেলিগ্রাম। বিদেশে যেতে হলেই তো জানি পাশপোর্ট নিতে হয়! নিজেদের দেশেও কিরকম বিদ্‌ঘুটে নিয়ম ছ্যাখো।

অমরনাথ বললেন, না বিদ্‌ঘুটে নিয়ম বোধ হয় নয়। আমার মনে হয় আন্দামান এখনও খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। হুড় হুড় করে বিনা অনুমতিতে লোকজন যদি আন্দামানে গিয়ে হাজির হয়, তা'হলে হয় ত এমন একটা-কিছু বিভ্রাট ঘটে যেতে পারে যা সাম্‌লানো দায় হয়ে উঠবে। জানি না এইটেই সত্যি কিনা, কিন্তু—

বলেই তিনি প্রসঙ্গটাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি তো না হয় এত কষ্ট করে আন্দামানে গিয়ে হাজির হলে, তারপর সেখানে গিয়ে যদি ছ্যাখো, বিশু চলে এসেছে?

শীলা বললে, চট্ করে চলে আসবার ছেলে কি-না!

—আন্দামান কত বড় জায়গা জানি না। বিশুর ঠিকানা জানো না, খুঁজে তাকে বের করবে কেমন করে?

—চেষ্টা করতে দোষ কি?

অমরনাথ বললেন, তাহ'লে তুমি যাবেই।

শীলা বললে, আমি একা নয়। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

—আমাকেও যেতে হবে? সমুদ্রের ওপর জাহাজে চড়ে সেই আন্দামানে?

শীলা বললে, বুঝেছি তুমি রাগ করেছ।

অমরনাথও জবাব দিতে কসুর করলেন না। বললেন, বুঝবে বই-কি! বুঝবার বয়েস তো হয়েছে!

শীলা বললে, নিশ্চয়ই হয়েছে। বয়েসটাকে তো ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। আর তোমার কি হয়েছে?

—আমার আবার কি হবে?

—সব-কিছু বুঝেও অনেক-কিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করছ।

অমরনাথ বললেন, বুঝতে পারলাম না, বুঝিয়ে বল।

কালো রঙের গরম স্কার্ফটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো শীলা। বললে, দিদি আমাকেই শুধু তোমার হাতে তুলে দিয়ে যায়নি, তোমাকেও দিয়ে গেছে আমার হাতে তুলে। তোমাকে এইখানে একা ফেলে দিয়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। কোথাও না।

দুরন্ত অভিমানে গলাটা তার ভারি হয়ে এলো।

পাঁচু এসে বললে, জল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে দিদিমণি।

—যাই। বলে চলে গেল শীলা।

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অমরনাথ একদৃষ্টে শুধু তাকিয়ে রইলো পরিপূর্ণ-যৌবনা বিদ্যুৎবরণী এই নারীর দিকে।

॥ দুই ॥

এবার অমরনাথের পালা।

আন্দামান যেতেই যখন হবে, শীলাকে ডেকে বললেন, এবার তুমি ঘর সামলাও, আমি বাইরেটা দেখি।

শীলার মুখে হাসি ফুটেছে। তার সেই মনোরম হাসি হেসে জামাইবাবুর সঙ্গে একটু রসিকতা করলে। বললে, এখনও আমার ঘরই হলো না তো সামলাবো কি ?

অমরনাথও হাসলেন। বললেন, এখন সময় নেই। পরে এর জবাব দেবো। আপাততঃ আমার হোমিওপ্যাথির বই আর ওষুধ-গুলো কেমন করে নেবে সেই ব্যবস্থা কর। আমি জাহাজের খবরটা নিয়ে আসি।

জাহাজের খবর আনতে গিয়ে অমরনাথ জেনে এলেন—হেল্‌থ্‌ সার্টিফিকেট না দেখাতে পারলে জাহাজের টিকিট পাওয়া যাবে না !

হেল্‌থ্‌ সার্টিফিকেট কি বস্তু, কোথায় পাওয়া যায়, অমরনাথের জানা ছিল না।

শীলা তো হেসেই খুন !

—প্রফেসারগুলো কোনও কাজের নয়। বই-এর বাইরে যে একটা পৃথিবী আছে তার কোনও খবর রাখবার অবসরই পায় না।

অমরনাথ বললেন, এখন আমি প্রফেসার নই, হোমিওপ্যাথ—ডাক্তার।

শীলা বললে, সে তো শুধু দেহের কারবার। রোগ আর রুগী। সে এক যন্ত্রণার রাজত্ব।

—তুমিও সে রাজত্বের অধিশ্বরী না হ'তে পার, একজন সেবা-দাসী তো হয়েছ।

—সুতরাং সেখানকার ছাড়পত্রটা কোথায় পাওয়া যায় এ-দাসী তা জানে। কাল আমি তোমাকে নিয়ে যাব সেখানে।

—সেখানে গিয়ে কি করতে হবে?

—গেলেই বুঝতে পারবে।

এর বেশি আর কিছু সে বললে না। কারণ শীলা জানে জামাই-বাবুর হোমিওপ্যাথি-শাস্ত্র মানুষের টিকে নেওয়ার বিরোধী! সেখানে গিয়ে শুধু কলেরা আর বসন্তের টিকে নিতে হবে শুনলে হয়ত' তিনি বেঁকে বসবেন।

কিন্তু বেঁকে তিনি বসলেন না।

পরের দিন রাইটার্স বিল্ডিংএ গিয়ে অমরনাথকে ভাল দেখে একটা চেয়ারে বসিয়ে শীলা হাসতে হাসতে বললে, তোলো এইবার জামার আস্তিনটা।

অমরনাথ নির্বিবাদে জামার হাতাটা তুলে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কতক্ষণই বা লাগে!

দু'জনেরই টিকে দেওয়া হয়ে গেল। হেল্‌থ্ সার্টিফিকেট দুটো পকেটে রেখে শীলা দেখলে, অমরনাথ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছেন।

মনে হলো সবই জানেন তিনি। শ্যালিকার সঙ্গে একটু রসিকতা করছিলেন।

—অমন করে হাসছো যে? শীলা জিজ্ঞাসা করলে।

অমরনাথ বললেন, কোনও হোমিওপ্যাথ যদি আমাকে এই অবস্থায় দেখে তো হাসবে।

শীলা বললে, তা হাসুক। এখন চল। এক্ষুনি গিয়ে টিকিট কিনে আনি। টাকা আছে তো সঙ্গে?

অমরনাথ বললেন, আছে।

বাঙ্কের টিকিট অমরনাথ কিছুতেই করতে চাইলেন না, চেয়ে বসলেন, দু'জনের সিট আছে—সেইরকম একখানা কেবিন।

শীলা বললে, কেন মিছেমিছি এতগুলো টাকা খরচ করছো?

অমরনাথ বললেন, আমার টাকা আছে বলেই করছি।

শীলার কোনও বারণ তিনি শুনলেন না। টু-সিটেড্ কেবিনের টিকিট নিলেন পোর্ট ব্লেয়ারের। জেনে নিলেন, কোন্ জেটি থেকে কোন্ তারিখে জাহাজ ছাড়বে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, সুরু হলো এবার আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা।

শীলা বললে, নিরুদ্দেশ কেন হবে? আমরা তো যাচ্ছি পোর্ট ব্লেয়ার।

—যাচ্ছি বটে, কিন্তু কপালে হয় ত এখনও অনেক দুঃখু আছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন অমরনাথ। বললেন, ভালবাসার বন্ধন মানুষকে এমনি পাগলই করে!

কিছুক্ষণ চুপ করে শীলা কি যেন ভাবলে। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে জামাইবাবু?

—কেন?

—এই যে সব-কিছু ছেড়েছুড়ে এখানকার পাট তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হচ্ছে?

অমরনাথ এইবার হাসলেন। হেসে বললেন, তোমার মত সঙ্গী পেলে মানুষ তো দেখি নরকে যেতেও রাজী হয়!

—সেরকম মানুষ যে তুমি নও।

—হলে খুশী হ'তে?

রাস্তায় ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। কথাটার জবাব না দিয়েই শীলা গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। অমরনাথ আর সে কথার জবাব চাইলেন না। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার আর কিছু কেনবার থাকে তো বল।

শীলা বললে, না। বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই। বাড়ী চল।

পাইকপাড়ার বাড়ীটা অমরনাথের নিজের বাড়ী। শীলাদের কলেজের একজন লেডি ডাক্তার একখানা বাড়ী খুঁজছিলেন।

অমরনাথ তাঁকেই দিয়ে গেলেন বাড়ীখানা। নিজেদের জিনিসপত্র একখানা ঘরে বন্ধ করে রেখে অমরনাথ বললেন, ঠিকানা দিয়ে গেলাম, আমার শালা বিশ্বনাথ যদি ফিরে আসে তো তাকে আটকে রেখে আমাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দেবেন।

লেডি ডাক্তার মিস্ সুমনা অধিকারী। ভাড়া কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি। জবাবে অমরনাথ বলেছিলেন, ভাড়া নিলে তো আপনাকে তুলতে পারব না। তার চেয়ে ভাড়া আপনাকে দিতে হবে না, কর্পোরেশনের ট্যাক্সের টাকাটা দিয়ে দেবেন শুধু।

তারপর হেসে বলেছিলেন, শীলাব এ সখের চাকরী। সখ মিটতে বেশি দেরি হবে না। জেনে রাখুন দু' এক মাস পরেই আমরা ফিরে আসব।

শীলার চাকরি করতে যাওয়াটা যে কিছুই নয়, আসলে সে যাচ্ছে তার ভাইকে খুঁজতে—এই কথাটা তিনি চেপে গেলেন।

মিস্ অধিকারীর চেহারা দেখলে বয়সটা ঠিক বুঝা যায় না। তিরিশও হতে পারে, আবার পঁয়ত্রিশ বললেও ভুল হয় না। মনে হয় খুব কম বয়েসেই বেশ পশার জমিয়ে নিয়েছেন। আঁটসাঁট গড়ন, গায়ের রং ফর্সা, সব সময়েই বেশ ফিট্‌ফাট্ থাকতে ভালবাসেন। মুখের চেহারায় কেমন যেন একটা বেপরোয়া বেপরোয়া ভাব।

বিনা ভাড়ায় থাকতে দেওয়ার প্রস্তাবটা তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। শীলাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, ভাড়া এ-বাড়ীর যতই হোক—মাসে মাসে পঞ্চাশটে করে টাকা আমি মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব আন্দামানে। বাড়ীর ট্যাক্সটাও দিয়ে দেবো। তোমাদের ঠাকুর-চাকর সবাই রইলো আমার কাছে, আমার কাজ করবে, যেমন মাইনে পাচ্ছিল তেমনি পাবে। বাড়ীটা যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা করব।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীলা তাঁর কথাগুলো শুনছিল।

ভেবেছিল এই বুঝি তার শেষ কথা, তাই একটি নমস্কার করে চলেও এসেছিল গেট পর্য্যন্ত। কিন্তু মিস্ অধিকারী আবার তাকে ফিরে ডাকলেন, শীলা!

শীলা ফিরে যেতে বাধ্য হলো। ডাক্তার সুমনা অধিকারী বললেন, এই যে ভাড়ার দরুণ পঞ্চাশটা টাকা আমি দেবো বললাম—কথাটা যেন এখন তুমি বলো না তোমার জামাইবাবুকে। কি জানি, ফট্ করে হয় ত বলে বসবেন—ওঁকে বাড়ি আমি দেবো না। খেয়ালী মানুষ তো! তাছাড়া এই সব মানুষ—মানে, কম বয়সে যারা বিপত্নীক হয় তাদের আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যেন কিছু মনে করো না। আর তোমাকেও বলছি—তুমিও যেন একটু সাবধানে থেকো।

মিস্ অধিকারীকে এত ভালো করে চিনতো না শীলা। মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান যে তাঁর এত গভীর—সে ধারণাও তার ছিল না। থাকলে বাড়ীখানা তাঁকে সে দিত না কিছুতেই। এখন আর কিছু বলাও যায় না।

তার পরের দিনই খিদিরপুর ডকে গিয়ে তাদের জাহাজে উঠতে হবে।

বাড়ীটা থাক্ না হয় সুমনা অধিকারীর হাতেই।

জামাইবাবুরও কিছু জেনে কাজ নেই।

লটবহর নিয়ে শীলা তো তার জামাইবাবুকে নিয়ে উঠলো গিয়ে খিদিরপুর ডকে। পাঁচু গিয়েছিল জাহাজে চড়াতে। কিন্তু পাঁচুর আর সেখানে কিছু করবার নেই। ডকের কুলিরাই মালপত্র নিয়ে ওজন করিয়ে যা করবার করলে। হেলথ্-সার্টিফিকেট আর টিকিট দেখিয়ে ছাড়পত্রের ছাপ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে জাহাজের তেতলায় গিয়ে উঠতে হলো শীলা আর অমরনাথকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট্ট একটি কেবিনে মুখোমুখি দুটি বিছানা পাতা। আলমারি, টেবিল, চেয়ার, আর্শি, বেসিন—অভাব কিছুই নেই। সামনে

বেরুলেই রেলিং দেওয়া খোলা বারান্দা।

পাঁচুর কিন্তু পছন্দ হলো না। জিজ্ঞাসা করলে, এইখানে কতদিন থাকতে হবে দিদিমণি ?

শীলা বললে, বলছে তো চারদিন।

—এই চাপা ঘরটায় দম বন্ধ হয়ে আসবে দিদিমণি। তুমি এই বারান্দায় গিয়ে বেঞ্চিটার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে থেকো। সামনে নদী—

—নদী কি রে হতভাগা, বল্ সমুদ্র।

পাঁচু বললে, জানি দিদিমণি, আমি অত বোকা নই। এর চেয়ে আর একটু বেশী চওড়া।

শীলা হাসতে লাগল। বললে, কত চওড়া তোর ওই বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, বুঝিয়ে দেবে।

বাইরের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন অমরনাথ।

জাহাজ ছাড়বার কথা চারটেয়, কিন্তু এখনও ছাড়লো না কেন—সেই কথাই কাকে যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন। সাজ পোষাক দেখলেই বুঝা যায় লোকটি জাহাজের কর্ম্মচারী। তিনি বুঝিয়ে বলছিলেন, বালি পড়ে পড়ে গঙ্গার অবস্থা এমন হয়েছে যে, বড় জাহাজ চালানো এখানে রীতিমতো শক্ত। ওই যে দেখছেন ষ্টীমার, ওকে বলে পাইলট্-ষ্টীমার। ও আমাদের পথ দেখিয়ে ধীরে-ধীরে নিয়ে যাবে। জাহাজ যখন সমুদ্রে গিয়ে পড়বে, তখন ওর ছুটি। এই জন্যেই দেরি হচ্ছে।

জাহাজের লোকজন তৎপর হয়ে উঠেছে। নোঙ্গর তুলছে। এবার সিঁড়িটা খুলে নেবে।

অমরনাথ ডাকলেন, পাঁচু, এবার তোকে নেমে যেতে হবে।

নেমে যাবার ইচ্ছা বোধ হয় পাঁচুর ছিল না। চোখদুটি তার ছলছল করে এলো। দিদিমণিকে প্রণাম করলে, অমরনাথকে প্রণাম করলে। অমরনাথ তার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললেন, এইটে

রাখ্, পেট ভরে একদিন সন্দেশ খাবি।

পাঁচ টাকার নোটখানি দিদিমণির দিকে তুলে ধরে হাসতে হাসতে বললে, পেয়ে গেছি দিদিমণি।

মুখে হাসি, চোখে জল!

পাঁচু নেমে গেল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কি পেয়ে গেছে?

শীলা বললে, 'মোগল-এ-আজ্ম্' ছবিটা দেখতে গিয়ে তিনদিন ফিরে এসেছে। কম দামী টিকিট পাওয়া যায় না।

পাঁচটা টাকা পেয়ে তাই ওর এত আনন্দ!

জাহাজটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো। ইঞ্জিন চলছে। ওদিকে ঘড় ঘড় করে ক্রেনের আওয়াজ হচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে জেটিটা মনে হচ্ছে যেন দূরে সরে যাচ্ছে। বন্দরের দুই তীরে নানান্ দেশের নানা রকমের বড় বড় জাহাজ। পশ্চিমের আকাশটা বিচিত্রবর্ণে রাঙা হয়ে উঠেছে। প্রকাণ্ড একটা জাহাজের মাস্তুলের ফাঁক দিয়ে রক্তবর্ণ অস্তসূর্য্যের লাল আলো এসে পড়েছে গঙ্গার জলে। তার ওপর প্রতিটি জাহাজে কতরকমের কত আলোর মালা। খিদিরপুরের রাস্তায় আলো জ্বলছে! জেটিতে, গুদোমে, কলে, কারখানায়, গঙ্গা-তীরের প্রতিটি বাড়ীতে মনে হচ্ছে যেন দীপালীর উৎসব সুরু হয়েছে। দিনান্তে ছুটির সিটি বাজছে কলে-কারখানায়। তার সঙ্গে মিশেছে জাহাজের ভোঁ। কিছুক্ষণ আগে যে-পুলের ওপর চলছিল কত-রকমের কত যানবাহন আর অগণিত মানুষের মিছিল, ভোজবাজির মত মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যেন তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলের ওপরের চলাচলের পথটা যেন সসম্ভ্রমে দুদিকে সরে গিয়ে আন্দামানের জাহাজের যাবার পথ করে দিলে। মন্থরগতিতে জাহাজ গিয়ে বড় গঙ্গার স্রোতের মুখে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

শীতের সন্ধ্যা। গঙ্গার হাওয়ায় রীতিমত শীত-শীত করছে।

জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল শীলা। আলোকোজ্জ্বল বন্দর

দূরে সরে যাচ্ছে। অন্ধকার আকাশে তারার মেলা। বন্দরের আলোগুলো মনে হচ্ছে যেন আকাশের গায়ে তারার মত ছোট হয়ে গেল।

অমরনাথ বললেন, ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছ কেন? গায়ে একটা কিছু দাও।

হঠাৎ যেন ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল শীলার।

কেবিন থেকে স্কার্ফটা গায়ে দিয়ে অমরনাথের জন্য একটা গরম চাদর হাতে নিয়ে তাঁরই পাশের চেয়ারটাতে এসে বসলো সে। জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কেমন লাগছে জামাইবাবু?

—তোমার কেমন লাগছে তাই বল।

—আমার খুব ভাল লাগছে।

অমরনাথ বললেন, কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি—

শীলা হেসে বললে, থামো। তুমি যেন সব সময়েই অধ্যাপক। বল ভাল লাগছে না খারাপ লাগছে? ও সব সূক্ষ্ম অনুভূতি-টনুভূতির ধার ধারি না আমি।

অমরনাথও হাসলেন। বললেন, ভাল লাগছে। আমারও খুব ভাল লাগছে।

—সত্যি বলছো?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

শীলা যেন নিশ্চিন্ত হলো। বললে, বাঁচলাম। আমার যা ভাবনা হয়েছিল!

—আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। অমরনাথ হাত বাড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, যাও তুমি সমস্ত জাহাজটা ওপর নীচে ঘুরে একবার দেখে এসো।

শীলা বললে, যাব?

বলেই সে উঠে দাঁড়ালো। ছোট মেয়ের মত আনন্দে একেবারে উল্লসিত হয়ে গিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

খানিকটা গিয়েই আবার ফিরে এলো। বললে, তুমি যাবে না ?

—না। আমি কাল সকালে দেখবো।

—থাক্, তাহ'লে আমিও কাল সকালেই দেখব।

অমরনাথ বললেন, না তুমি এক্ষুনি দেখে এসো।

এই বলে তিনি তাকে একরকম জোর করেই পাঠিয়ে দিলেন।

সমস্ত জাহাজটা দেখে শীলা যখন ফিরে এলো, তাদের তখন খাবার ঘণ্টা পড়েছে।

হাতের ঘড়িটা দেখে শীলা বললে, ওমা, এখন তো সবে সাড়ে ছ'টা, এরই মধ্যে খেতে হবে ?

—জাহাজের এই নিয়ম। অমরনাথ বললেন, আমাদের ঘরে খাবার দিয়ে গেছে, এখন ইচ্ছে না হয় খেয়ো না।

—খাবারের ঘর তো রয়েছে। ঘরে খাবার দিয়ে গেল কেন ?

—আমিই দিতে বললাম।

শীলা বললে, চল, খাবে চল। শীতের রাত্রি, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে পারবে না।

ছোট্ট টেবিলে পাশাপাশি দু'জনে খেতে বসলো।

খেতে বসে শীলা এই জাহাজের গল্প আরম্ভ করলে।

—মস্ত বড় জাহাজ। চারতলা। আমি সব দেখে এলাম।

অমরনাথ বললেন, এটা খুব ছোট জাহাজ। ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় জাহাজগুলো আমাদের এই গঙ্গার বন্দরে আসতে পারে না। এই দ্যাখো না, গঙ্গার জলে এখন ভাটা পড়েছে, জাহাজ এখন আর চলছে না। জোয়ার এলে আবার চলবে।

—সমুদ্রে পড়বে কখন ?

—কাল রাত্রে। গঙ্গা পার হতেই চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে।

—সাগর সঙ্গম আমরা দেখতে পাব না তাহ'লে ?

—বোধ হয় না।

জাহাজের কেবিনের সেই ছোট্ট ঘরখানির ভেতর পাশাপাশি দুটি বিছানায় শুয়ে শীতের রাত্রি প্রভাত হলো।

দেখা গেল, গঙ্গায় জোয়ার এসেছে। জাহাজ চলছে।

ভাল চা না হলে অমরনাথ খেতে পারেন না। কাল জাহাজে যে চা দিয়েছিল, সে চা খাওয়া যায় না। শীলা কখন যে বিছানা ছেড়ে উঠেছে, বাথরুমে গিয়ে স্নান করে এসেছে, তারপর কিচেন্ থেকে গরম জল এনে নিজেদের টি-পটে চা ভিজতে দিয়ে জামাইবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলেছে, ভাল চা যদি খেতে চাও তো তাড়াতাড়ি ওঠো।

ধড়মড় করে উঠে বসেছেন অমরনাথ।

এত দেরি করে কোনোদিনই তিনি ঘুম থেকে ওঠেন না। কলকাতার বাড়ীতে ঘুম তাঁর যখন ভাঙতো, ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজতো। সূর্য্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। তাহ'লে কি গঙ্গাবক্ষে জাহাজের এই ছোট্ট ঘরখানিতে তিনি খুব বেশি আরাম পেলেন?

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে এসে চা খেতে বসে প্রথমেই অবাক হয়ে গেলেন—চায়ের চেহারা দেখে। বললেন, বাড়ীর চা মনে হচ্ছে যে?

শীলা বললে, বাড়ীর লোক সঙ্গে রয়েছে, বাড়ীর চা মনে হবেই তো!

—কাল আমি চা খেতে পারিনি তুমি সেটা লক্ষ্য করেছ তাহ'লে?

—চা তো সামান্য ব্যাপার, আরও অনেক কিছু লক্ষ্য করছি।

এই বলে মুখ টিপে একটু হেসে নিজের চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়ে শীলা আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখলে, কথাটা শুনে জামাইবাবুর মুখের চেহারাটা কেমন হলো।

অমরনাথ ধরেছেন ঠিক।

বললেন, এত দেরিতে কোনোদিন উঠি না—এই কথা বলতো

তো ?

—হ্যাঁ। সারারাত কি সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিলে কে জানে !

—স্বপ্ন ? হ্যাঁ—স্বপ্নই বটে। অমরনাথ চা খেতে খেতে থেমে থেমে বলতে লাগলেন, তবে সুখ-স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন জানি না। স্বপ্ন তো সত্য নয়, কাজেই স্বপ্নটাকে আমি তেমন আমল দিই না। এখন আর সেটা মনেও পড়ছে না।

শীলা হেঁট মুখে চা খেতে খেতে শুনছিল। চোখ তুলে একবার তাকালে। বললে, একটু চেষ্টা করলেই মনে পড়বে। এত ভুলো মন তোমার নয় আমি জানি।

অমরনাথ বললেন, আমাব মনটাকেও তুমি জেনে ফেলেছ ? সেটা তো ভাল লক্ষণ নয়।

—পুরোপুরি জানি বলে অহঙ্কার করব না। তবে অনেকখানি জানি।

এই বলে শেষ চা টুকু খেয়ে নিয়ে কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে বললে, জানবার সুযোগটা অবশ্য তুমিই করে দিয়েছ।

অমরনাথের খাওয়া তখনও শেষ হয়নি। বললেন, না রে না, অপরের মনকে জানা অত সহজ নয়। নিজের মনটাকেই আমরা ঠিক মত চিনি না।

চা খাওয়া তিনিও শেষ করলেন। শেষ করে বললেন, এই ধর না, যে-কথা বা যে-চিন্তা আমার মনে কোনোদিন উদয় হয়নি, হঠাৎ একদিন রাত্রে হয় ত সেই স্বপ্ন দেখে বসলাম। স্বপ্ন তো আমাদের অবচেতন মনের প্রকাশ।

বলেই একটু হেসে কাপটা হাত থেকে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, থাক্ আর বড় বড় কথা বলব না। এক্ষুনি হয় ত বলে বসবে—আমি মনে-প্রাণে অধ্যাপক। স্বপ্ন-তত্ত্ব আলোচনা করতে বসেছি।

—স্বপ্ন-তত্ত্ব আলোচনা কর ক্ষতি নেই, কিন্তু স্বপ্ন আর দেখো না।

কাপডিসগুলো ট্রের ওপর তুলে সরিয়ে রাখতে রাখতে শীলা আপনমনেই যেন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

—হাসলে যে ?

শীলা বললে, গঙ্গার ওপরেই যদি এত স্বপ্ন দ্যাখো তো জাহাজ যখন মহাসমুদ্রে গিয়ে পড়বে তখন কি করবে কে জানে!—বাইরেটা একবার দেখে আসি।

হাস্যাধরা শীলা সে এক অপরূপ ভঙ্গীতে একপিঠ খোলা চুল দুলিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

রান্নার হাঙ্গামা নেই, ঘরের কাজকর্ম্ম নেই, নিরবচ্ছিন্ন অবসর যেন চারিদিকে ছড়ানো।

আবার আর-একটা রাত্রি কেটে গেছে নিঃস্বপ্ন এবং নিশ্চিন্ত নিদ্রায়।

রাত্রির অন্ধকারে গঙ্গা পার হয়ে জাহাজটা কখন্ যে সমুদ্রে এসে পড়েছে—তারা বুঝতেও পারেনি।

অমরনাথের ঘুম যখন ভেঙ্গেছে, কেবিনের ভেতর তখন রীতিমত অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বেলেই দেখেছেন—ঘড়িতে তখন ঠিক পাঁচটা। শীলার খাটের দিকে নজর পড়তেই আলোটা তিনি নিবিয়ে দিয়েছেন। গায়ের লেপটা শীলা বোধকরি ঘুমের ঘোরে সরিয়ে ফেলেছে। এলো খোঁপা করে বেঁধেছিল মাথার চুল, তাও খুলে গেছে। একটা হাত মাথার নীচে, আর-একটা হাত মুখের পাশ দিয়ে বালিশের ওপর ছড়ানো। ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই, পাতলা ফিন্‌ফিনে একটা জ্যাকেট্ পরে শুয়েছে, তারও বোতাম খোলা। শীলা আর সে ছোট্ট মেয়েটি নেই। এখন সে এক উদ্দামযৌবনা নারী।

ভাবলেন একবার লেপটা গায়ের ওপর টেনে দিই। কিন্তু কি জানি কেন তা পারলেন না অমরনাথ। অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে ব্রাশ-টুথপেষ্ট্ নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

জাহাজটা দুলছে। টলে পড়ে যেতে যেতে টাল্ সামলে নিলেন। তারপর কেবিনের দোরটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে চ'লে গেলেন বাথ-রুমের দিকে।

যেতে যেতে থমকে থামতে হলো সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। জাহাজের আলো গিয়ে পড়েছে সমুদ্রের জলে। সাদা সাদা ফেনার ওপর দিয়ে ঢেউগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে দূরে সরে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে।

জলের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন—জাহাজ বেশ জোরে জোরে চলছে। অতলস্পর্শী সমুদ্রের ওপর দিয়ে এখন তার বাধা-হীন পথ। এখন আর তার পথ দেখাবার জন্য পাইলটের প্রয়োজন নেই। গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে পাইলট-ষ্টিমার তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার ফিকে হয়ে এলো।

দিগন্তবিস্তৃত শুধু জল আর জল। কালো কালির মত কালো জল।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন অমরনাথ। দেখার সাধ যেন মিটছে না কিছুতেই। চোখ ফেরাতে পারছেন না এই অতলান্ত সমুদ্রের ওপর থেকে। এত ভয়ঙ্কর সুন্দর সে রূপ!

হঠাৎ খুট্ করে আওয়াজ হতেই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, কেবিনের দোর খুলে শীলা দাঁড়িয়ে।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে বলে উঠলো, সমুদ্র?

অমরনাথ বললেন, হ্যাঁ। দেখবে এসো।

—উঠে চলে এসেছ? আমাকে তুলে দাওনি কেন?

বলতে বলতে পরণের কাপড়টাকে শুধু টেনেটুনে এসে দাঁড়ালো

শীলা।

জলের রংটা কালো, না? তাই বোধ হয় কালাপানি বলে।

অমরনাথ বললেন, বোধ হয় তাই।

—বোধ হয় কেন? পুরীর সমুদ্র তো দেখেছি, তার রং তো এরকম নয়।

শীলার হঠাৎ নজর পড়লো অমরনাথের হাতের দিকে।

—আরে, এখনও তুমি…

কথাটা শেষ হবার আগেই অমরনাথ চলে যাচ্ছিলেন। শীলা বললে, দাঁড়াও। কই দেখি—

অমরনাথ ফিরে দাঁড়াতেই তার হাত থেকে টুথ-পেষ্টের ফাইলটা নিয়ে নীচের দিকটা টিপে খানিকটা পেষ্ট্ নিজের আঙ্গুলে লাগিয়ে সেটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, যাও এবার।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে অমরনাথ দেখলেন, শীলা কাপড় জামা বদলে ফিটফাট্ হয়ে তার জন্যে চা নিয়ে বসে আছে।

—বাঃ, একেই বলে আদর্শ সেবাদাসী।

—গ্যাখো, সেবাদাসী কথাটা শুনলে আমার কিন্তু রাগ হয়।

—তা তো হবেই। আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েরা দাসী হতে চায় না।

—কোনও কালের কোন মেয়েদেরই দাসী হতে চাওয়া উচিত নয়।

অমরনাথ বললেন, তা সত্যি। কিন্তু তুমি আই-এস-সি পাশ করে নার্সিং শিখলে। নার্সদের বাংলায় অমনি কি-একটা বলে যেন?

—'সেবিকা' আর 'সেবাদাসী' এক হলো বুঝি?

—হ্যাঁ ওই একই কথা।

এই বলে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন অমরনাথ।

শীলা বললে, এমনি সব নানান্ কথা বলে বলে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, নানা রকম করে মেয়েদের তোমরা ঘরের ভেতর···

শীলার মুখের কথা মুখেই আটকে রইলো। মুখ তুলেই দেখতে পেলে অমরনাথ হাসছেন। শীলা বললে, বুঝেছি। তুমি আমাকে রাগাবার চেষ্টা করছ। আমি পালাই বাবা।

এই বলে চায়ের পেয়ালাটা শেষ করেই শীলা সত্যিই পালিয়ে গেল।

অমরনাথ তাঁর হোমিওপ্যাথির বই নিয়ে বসলেন। জাহাজে ওঠবার পর থেকে হোমিওপ্যাথির বই তিনি খোলেননি।

খানিক পরেই শীলা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে—সুমুখের আকাশটা নাকি কালো মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে।

বই থেকে মুখ না তুলেই অমরনাথ বললেন, বেশ তো! বৃষ্টি হবে!

—না না বৃষ্টি নয়। একটা সাইক্লোন আসছে জেনে এলাম।

অমরনাথ বললেন, আসুক না!

—আসুক না? শীলা বললে, আচ্ছা নির্বিকার মানুষ তো! সাইক্লোন এলে আমাদেব অবস্থাটা কি হবে বুঝতে পেরেছ?

অমরনাথ বললেন, খুব মজা হবে। জাহাজটা একটু বেশি বেশি দুলবে আর তুমি এইখানে গড়াগড়ি দেবে।

শীলা বললে, বয়ে গেছে আমার গড়াগড়ি দিতে! আমি বাবা চাপাচুপি দিয়ে শুয়ে পড়বো আমার বিছানায়, কেবিনের দোরটা দেবো বন্ধ করে। আর তুমি থাকবে ওই ডেকের ওপর। বসে বসে সাইক্লোন দেখবে আর মজা করবে।

অমরনাথ ম্লান একটু হেসে বললেন, অদৃষ্টে যদি থাকে তো তাই করব।

—না না তুমি যে বললে খুব মজা হবে তাই বললাম।

অমরনাথ বললেন, দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব ভয় পেয়েছ।

শীলা বললে, তোমার হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে এর কোন ওষুধ আছে নাকি ?

—কিসের ?

সাইক্লোনের ভয় কাটাবার। থাকে তো দাও, খেয়ে ফেলি।

অমরনাথ বললেন, হোমিওপ্যাথি নিয়ে রসিকতা হচ্ছে ?

—হোমিওপ্যাথি নিয়ে নয়, তোমাকে নিয়ে। সাইক্লোন যখন আসবে তখন বুঝবে মজা। ওই রকম মুখ টিপে টিপে হাসি বেরোবে।

এই বলে শীলা তার বিছানাটা ভাল করে টেনেটুনে ঠিক করতে করতে বললে, পড়োনি তো শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, পড়লে বুঝতে জাহাজের ওপর সাইক্লোনের কি মজা।

অমরনাথ বললেন, তোমার কি টগর-বোষ্টুমী হতে সাধ যাচ্ছে নাকি ?

—ও! পড়েছ তাহ'লে ?

—তুমি কি ভাবো আমি শুধু ইস্কুল-কলেজের বই ছাড়া আর কিছু পড়িনি ?

শীলা বললে, এক-একসময় তাই মনে হয়।

—তবে তাই হোক্।

বলেই হোমিওপ্যাথি বইটা বন্ধ করে দিয়ে অমরনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপাততঃ তুমি টগরও নও, অভয়াও নও, আমি নন্দ-মিস্ত্রিও নই, অভয়ার রোহিনীদাও নই। কাজেই ভয় নেই, চল তোমার সাইক্লোনের মেঘই দেখে আসি।

এই বলে হাসতে হাসতে দু'জনেই তারা ডেকের রেলিং ধরে গিয়ে দাঁড়ালো।

আকাশের একটা দিক সত্যি সত্যিই কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। নীচে সমুদ্রের কালো জল আর সেই কালো জলের ওপর ঘন ঘন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে ঢেউ-এর পর ঢেউ আর সাদা সাদা ফেনা।

যেমন ভয়াবহ তেমনি সুন্দর !

ভারি জাহাজ, তবু মনে হচ্ছে যেন বড় বেশি বেশি দুলছে।

মন্দ লাগছে না অমরনাথের।

শীলা তো হেসেই সারা !—কেমন ? বাড়ীতে বসে থাকলে এই জিনিস দেখতে পেতে ?

সাইক্লোন কিন্তু দেখা গেল না।

সারাটা দিন মেঘলা-মেঘলা কাটবার পর সন্ধ্যায় এক পশলা বৃষ্টি নামলো।

ক্যাপ্‌টেনের ঘর থেকে অমরনাথ খবর নিয়ে এলেন—সাইক্লোন নাকি মোড় ফিরে অন্য পথে চলে গেছে।

শীলা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, মিছে কথা। এই যে বৃষ্টি নেমেছে, এইটেই ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে রাত-দুপুরে দেখবে জাহাজটাকে এসে আক্রমণ করবে। ভালই হবে। ঘুমের ঘোরে আমি তো কিচ্ছু বুঝতেই পারব না ! তলিয়ে যাব সমুদ্রের তলায়। বাস, সব শেষ !

বলেই খিল্ খিল্ করে হাসি !

অমরনাথ বললেন, পাগল হলে নাকি ?

—হইনি এখনও। হব-হব করছি।

অমরনাথ বললেন, হতে আমি দেবো না। আমার কাছে ওষুধ আছে।

—দাও না ! খাই।

অমরনাথ হাসলেন।—পাগল হতে এখনও দেরি আছে। তুমি একটু ঘুরে এসো—যাও, সাইক্লোনের খবরটা সবাইকে জানিয়ে এসো।

—কি বলব ? সাইক্লোন হবে না ?

অমরনাথ বললেন, না হবে না। জাহাজে 'রাডার' যন্ত্র আছে। তাইতে ধরা পড়েছে।

—'রাডার' না ছাই! মানুষের শরীরেও একটা রাডার আছে। সেটা তার মন। সেই রাডারে তার ভবিষ্যতের ছায়া পড়ে।

—তোমার 'রাডার' কি বলে? তোমার ভবিষ্যৎ?

—তোমার ও-সব কথা কেন? এক্ষুনি তো আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলে! কিন্তু যাই কেমন করে? বৃষ্টির ঝাঁট আসছে যে!

অমরনাথ বললেন, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। তাকিয়ে ছাখো না!

শীলা পেছন ফিরে সত্যিই দেখলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে।

—চললাম। তোমার মনস্কামনাই পূর্ণ হোক্!

বলেই আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করলে না শীলা। গায়ের কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

অমরনাথ চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

ভাববার কথাই।

মেয়েটা হঠাৎ যেন অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ভাই-এর খোঁজে সে আন্দামানে যাচ্ছে, সেকথা সে ভুলেই গেল কিনা তাই-বা কে বলতে পারে!

খানিক পরেই শীলা আবার ওপরে উঠে এলো। এবার আর একা নয়, সঙ্গে একটা লোক।

লোকটাকে বাইরে দাঁড়াতে বলে শীলা কেবিনে ঢুকলো।

টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে অমরনাথ বই পড়ছিলেন। শীলা তার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, একে একটু ওষুধ দাও তো জামাইবাবু!

—কি হয়েছে?

—সেই যে সেই মেরিন্ ইঞ্জিনিয়ার—তোমার ছাত্র—পরিমল না পরিতোষ কি যেন নাম—তাঁকে যে ওষুধ দিয়েছিলে, সেই ওষুধ।

অমরনাথ দেখলেন মস্ত লম্বা একটা মানুষ দু'হাত দিয়ে দোরের

চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো বড় বড়—মনে হচ্ছে যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। গায়ে মাংস না থাকলেও কব্জির হাড়গুলো বেশ মোটা, দেখলে মনে হয় লোকটা এককালে বেশ বলবান ছিল।

মানুষটা কথা বলছে না দেখে অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়া হুয়া তোমারা ?

এতক্ষণে সে কথা বললে।—বাংলায় বলুন বাবু, আমি বাঙ্গালী।

—কি হচ্ছে তোমার ?

—খালি খালি মাথা ঘুরছে বাবু, টলে টলে পড়ে যাচ্ছি আর বমি হচ্ছে।

শীলা বলে উঠলো, সি-সিক্‌নেস্।

লোকটি বললে, না গো দিদি, ও-সব কিছু নয়। এই শালা আন্দামান-জাহাজে যে-খাবার দেয় সে-খাবার মানুষে খায় না। নীচে যে-লোকটা হোটেল করেছে, ওর খাবার খেয়ে খেয়ে এইরকম হয়েছে বাবু। আমার একার তো হয়নি, অনেক লোক দেখুন গে শুয়ে পড়েছে।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, তারা ওষুধ খায়নি ?

—খাচ্ছে। জাহাজের ডাক্তারবাবু দিচ্ছে কি-সব ছাই ভস্ম—ওয়াক্ !

বলতে বলতেই ওয়াক্ তুললে লোকটা। বমি কিছুই করলে না, শুধু বসে পড়লো পেটে হাত দিয়ে। খানিক্ সামলে নিয়ে বললে, পেটে কিছু থাকলেই তো উঠবে ?

অমরনাথ শীলার দিকে তাকালেন। বললেন, আমার হোমিওপ্যাথির ছোট ব্যাগটা থেকে ওষুধের শিশিটা বের কর। 'ককুলাস্ ইণ্ডিকাস্'—ওষুধটার নাম।

শীলা আলমারি খুলে ওষুধ বাছতে লাগল। অমরনাথ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ডাক্তারবাবুর ওষুধ না খেয়ে

এখানে এলে কেন ?

লোকটি জবাব দিল না। জবাব দিলে শীলা। ওষুধের শিশি তুলে তুলে (দেখতে দেখতে) বললে, এ্যালাপ্যাথি ওষুধ ও খাবে না। বলছে, ও ওষুধ খেলে পেট থেকে রক্ত উঠবে।

—না বাবুসায়েব, ও ওষুধ আমি কখনও খাই না। জেলখানায় থাকতে হাঁসপাতালের ডাক্তার একবার শুধু ফুঁড়ে দিয়েছিল এইখানটায় .....

বলেই সে তার হাতকাটা সার্টটা একটুখানি তুলে জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই দেখুন, এখনও ডাব-মতন হয়ে আছে। এই এতখানি ফুলে উঠেছিল বাবু।

জেলখানার নাম শুনেই অমরনাথ লোকটির মুখের দিকে ভাল করে তাকালেন আর-একবার। জিজ্ঞাসা করলেন, জেল হয়েছিল তোমার ?

—হ্যাঁ বাবু, কালাপানি। ঠেলে দিয়েছিল আন্দামানে। তবে বেশিদিন খাটতে হয়নি। জাপানী এসে, দিলে ইংরেজদের মেরে তাড়িয়ে। আমাদের ছুটি হয়ে গেল।

—তোমাদের ছুটি হয়ে গেল ?

—ছুটি ? কয়েদীদের আবার ছুটি ! ও-ব্যাটারা আরও বজ্জাত। আমাদের মেরে মেরে কাজ করাতো বাবু। জঙ্গল কাটো, পাহাড় কাটো, আর রাস্তা তৈরি করো ! পোর্ট-ব্লেয়ারে হাওয়াই-জাহাজ নামবার জায়গাটা—আমরা তৈরি করেছি।

ওষুধটা বের করে হোমিওপ্যাথির ছোট শিশিটি শীলা নামিয়ে দিলে অমরনাথের হাতের কাছে। অমরনাথ তাই থেকে ছোট ছোট কয়েকটি গ্লবিউল বের করে লোকটিকে বললেন, হাঁ কর, আমি তোমার মুখে ফেলে দিচ্ছি।

ওষুধটা খেয়ে লোকটি বললে, এইতে ভাল হয়ে যাবে বাবু ?

—হতেও পারে।

বলেই অমরনাথ তাকে কেবিনের ভেতর উঠে এসে বসতে বললেন।

ছোট কেবিন। অমরনাথের পায়ের কাছে মেঝের ওপর চেপে বসলো সে। বসেই জিজ্ঞাসা করলে, আপনারাও কি আন্দামানে যাচ্ছেন বাবুজি?

অমরনাথ বললেন, হ্যাঁ। তোমার নাম কি?

—নাম বাসুদেব ভট্‌চাজ। আমি বামুনের ছেলে বাবু।

অমরনাথ কি যেন ভাবতে ভাবতে তাঁর কলমটা বের করে একটা কাগজের ওপর লিখলেন—শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য।

—কোথায় থাকো এখন?

—আন্দামানেই থাকি। এবার্ডিন্ বাজারে একটা পান-বিড়ির দোকান আছে।

অমরনাথ লিখলেন, এবার্ডিন বাজার। আন্দামান।

—ও সব কি লিখছেন বাবু? আপনি কি পুলিশের লোক নাকি?

অমরনাথ হেসে বললেন, না আমি পুলিশের লোক নই। তোমার কোনও ভয় নেই।

—ভয় আমি কাউকে করি না বাবু। ওই জিনিসটে আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই।

এই বলে হাসলে বাসুদেব।

হেসে বললে, এখন আর পুলিশের হ্যাঙ্গামা-ট্যাঙ্গামা ভাল লাগে না বাবু। বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছি তো! একটা ছেলেও হয়েছে।

—আন্দামানেই বিয়ে করেছ? অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

—তাছাড়া কলকাতায় আমাকে মেয়ে কে দেবে বাবু? সেখানে তো সবাই আমাকে খুনেরা গুণ্ডা বলে জানে। মিছে কথা বলব না বাবু, পেথমে বিয়ে করেছিলুম একটা মাদ্রাজি মেয়েকে। মেয়েটা

সুবিধের হলো না। এক বছর ঘর করেও বাগে আনতে পারলুম না শালীকে। দিলুম ছেড়ে। এখন যেটাকে এনেছি সেটা ভাল।

—এও কি মাদ্রাজি নাকি?

—না বাবু। এ বাঙ্গালী। বুড়ো বাপ মরে গেল। মেয়েটা পথে বসে গেল বাবু। ভদ্দরলোকের বাড়ী বাড়ী কাজকম্ম করতো, লাথি ঝাঁটা খেতো, আর বুঝতেই তো পারছেন, জোয়ান মেয়ে, এ-সব ব্যাপারে সব শালাই ভদ্দরলোক! রাস্তায় যেতে যেতে একদিন দেখি কিনা—একটা বাড়ীর দরজায় একটা গাছের তলায় বসে বসে মেয়েটা কাঁদছে। বললুম, হেই ছুঁড়ী, কাঁদছিস কেন? মেয়েটা কথা বললে না। এ-সব কথা মেয়েরা মুখ ফুটে বলতেও পারে না। হাবে-ভাবে বুঝে নিতে হয়। বুঝলুম। বললুম—লোকটাকে দেখিয়ে দিতে পারিস? মেয়েটা বললে, এই বাড়ীতে কাজ করতুম। এই বাড়ীর বাবুই আমার সব্বনাশ করেছে! ডাকলুম বাবু বাবু বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। বাবু বেরিয়ে এলো। হাত জোড় করে বললুম, এ কাঁদছে কেন বাবু?

বাবু চোখ রাঙিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। বললে, তোর কি রে ব্যাটা? তুই শালা কে? তুই কি ওর বাবু নাকি? ভাগ্! কথা শুনে আমার মাথায় বাবু খুন চেপে গেল। বললুম, চোখ রাঙিয়ো না বলছি! আমি খুনে আসামী। চার-চারটে খুন করেছি এই হাত দিয়ে। লোকটা খেঁকিয়ে উঠলো—ভারি খুন করনেওলা! ভাগ্ এখান থেকে। এই বলে ঘরে ঢুকে ব্যাটা খিলটা দিলে বন্ধ করে।

মেয়েটা বললে, মাইনের দরুণ আমি তিরিশটে টাকা পাব, দিয়ে দিক্, আমি চলে যাচ্ছি। কোথাকার বোকা মেয়ে রে বাবা! বললাম, তিরিশটে টাকা পেলেই ছেড়ে দিবি ওকে? মেয়েটা আবার কেঁদে উঠলো। মুখে কিছুই বলতে পারলে না। বললাম, দাঁড়া তোর টাকা আমি আদায় করে দিচ্ছি।

শুনলুম ঘরের ভেতর কে একটা মেয়ে যেন চেঁচাচ্ছে। বাইরে থেকেই কথাগুলো তার শোনা যাচ্ছিল। মেয়েটা বলছে, ছুঁড়িটাকে নিয়ে এলো কাজ করতে! বলে কিনা কোলে তোমার কচি ছেলে কাজ করতে কষ্ট হবে! মারুক্ তোমাকে। না মারলে তুমি জব্দ হবে না।

দুমাদ্দুম্ দোরে মারলুম লাথি। খিলটা ভেঙ্গে দোরটা খুলে গেল। দেখলুম কালোমত একটা মেয়ে কোলে একটা কচি ছেলে নিয়ে মেঝের ওপর বসেছিল। আমাকে দেখেই বলে উঠলো, মুখপোড়া দোর ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলো দ্যাখো! কি চাও তুমি?

বললুম, মেয়েটা মাইনের দরুণ তিরিশটে টাকা পাবে, দিয়ে দাও; আমি চলে যাচ্ছি।

মেয়েটি বললে, হতভাগী আমার সব্বনাশ করে গেল আবার টাকা কিসের?

বললুম, কে কার সব্বনাশ করেছে তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর।

মেয়েটা বলে কিনা—ব্যাটাছেলেরা অমন করেই থাকে, তাই বলে ও সব্বনাশী দেবে কেন?

বাস্ যেই-না বলা, ব্যাটাছেলেটা দুম্ করে আমার পায়ের ওপর মারলে এক লাথি! আচম্‌কা লাথি খেয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়েই দিলাম হাত চালিয়ে। বাবু উল্‌টে গিয়ে পড়লো জানালার কাছে। আমি আবার গিয়েছিলাম তাকে মারতে। মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠলো, মেরো না আর মেরো না, আমি দিচ্ছি। ভেবেছিলুম টাকাটা দেবে বুঝি। কিন্তু টাকা কোথায়? হাতে ছিল মাত্র দুগাছা চুড়ি। তাই থেকে একটা খুলে নিয়ে সে আমার গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এইটে নিয়ে যাও।

সোনার চুড়ি। ভাবলুম গরীব মেয়েটাকে দিয়ে দিইগে যাই। কিন্তু কী যে হলো বাবু, কিছুতেই নিতে পারলুম না চুড়িটা। হাত

দিয়ে ছুঁতে পর্যন্ত পারলুম না।

আমার মার খেয়ে বাবুটি তখনও উঠতে পারেনি। পেটে হাত দিয়ে জানালার কাছে বসে।

বললুম, এই তোমার মুরোদ! ছি!

মেয়েটিকে বললুম, তোমার স্বামী ওই মেয়েটার যে-সব্বনাশ করেছে, তোমার এই চুড়ি দিয়ে তার দাম দেওয়া যাবে না, এটা তুমি রাখো। তোমার স্বামীটি মানুষ নয় মা, ও একটি আস্ত জানোয়ার। এই বলে চলে এলুম সেখান থেকে। মেয়েটাকে এসে বললুম, তোর কপাল খারাপ। টাকা পাওয়া গেল না। এখন কি করবি তুই? যাবি আমার সঙ্গে? খেতে দেবো, চল্। মেয়েটা সুড় সুড় করে চলে এলো বাবু আমার বাড়ীতে। সেই যে এলো, আর গেল না।

শীলা তার খাটের ওপর গিয়ে বসেছিল। সেইখান থেকেই বাসুদেবের কথাগুলো শুনলে।

বাসুদেব থামতেই জিজ্ঞাসা করলে, এখন কেমন লাগছে?

বাসুদেব তার দিকে ফিরে বললে, কাকে দিদিমণি? পুষ্পকে? খুব ভাল মেয়ে, দিদিমণি। ওর ছেলেটা যা হয়েছে, আমার মতন একটা কয়েদীর ছেলে বলে মনে হবে না। ব্যাটাকে আমি লেখা-পড়া শেখাবো।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমার শরীরটা কেমন লাগছে তাই বল।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ যেন শরীরের কথাটা মনে পড়লো বাসুদেবের। টান টান হয়ে নড়ে চড়ে উঠে বসলো ভাল করে। বললে, বাঃ, আচ্ছা ওষুধ তো! ভাল হয়ে গেছে বাবু।

মুখ ফিরিয়ে বললে, ভাল হয়ে গেছে গো দিদি। শরীল একেবারে ঝন্‌ঝনে।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি এই প্রথম জাহাজে চড়লে

বাসুদেব ? পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে কোথায় গিয়েছিলে ?

—গিয়েছিলুম কলকাতায় দিদিমণি। এই নিয়ে আমার দুবার জাহাজে চড়া হলো। প্রথম এসেছিলুম কয়েদী হয়ে। তখন গায়ের রক্ত ছিল তাজা। এরকম কিছু হয়নি। তারপর এই তো দিন দশ-বারো আগে এসেছিলুম কলকাতায়। তখনও কিছু হলো না। তাই তো বলছি গো দিদি, এই শালা হোটেলের ভাত খেয়েই এমনটি হলো। কয়েদেও এত খারাপ খাইনি, জাপানীরাও এত খারাপ খাওয়ায়নি।

—কলকাতায় কি জন্যে গিয়েছিলে ? কে আছে সেখানে ?

বাসুদেব বললে, গিয়েছিলুম দুটো কারণে দিদিমণি। আমি যখন ধরা পড়ে গেলুম, তারপর বিচারে যখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়ে গেল, তখন যে শালা-শালীরা হেসেছিল টিট্‌কিরি দিয়েছিল, তাদের একবার দেখা দিয়ে এলুম। আর দু'নম্বর কারণটা হলো গিয়ে—সেইটেই আসল। আমাকে মানুষ করেছিল বাবু আমার এক খুড়ী। নব্বই বছর বয়েস, বুড়ী যখন এখনও বেঁচে রয়েছে বাবু, মনটা কেঁদে উঠলো, ভাবলুম একবার দেখে আসি। যদি আসতে চায় তো নিয়েও আসবো এইখানে। টাকাকড়ি আমি সঙ্গে করে নিয়েও গিয়েছিলুম বাবু। আমি ঘর-সংসার পাতিয়েছি, বিয়ে করেছি, একটি ছেলে হয়েছে বললুম। পুষ্প বস্তির মেয়ে তা বলিনি বলেছি বামুনের মেয়ে—রিফুজি। শুনে খুব খুশী হলো। চোখে ভাল নজর চলে না তো ! আমার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখলে। খুব কাঁদলে বাবু, আমিও খুব কাঁদলুম।

বাসুদেবের বড় বড় চোখ দুটো জলে ভরে এলো। টপ্ টপ্ করে' দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো জামা দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললে, আসতো যদি, আমি মাথায় করে নিয়ে আসতুম। কিন্তু এলো না বাবু, তার ছেলে-বৌ আসতে দিলে না। বললে,

তোর জাত গেছে। তোর ঘরে মাকে আমরা পাঠাতে পারবো না। মা কিন্তু আসবার দিনে আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, আর হয় ত আমাকে দেখতে পাবি না বাসু। আশীর্ব্বাদ করছি—ছেলে-বৌ নিয়ে তুই সুখে থাক্! আর এইটি নে। তোর ছেলে বৌ-এর হাতে দিবি আমার নাম করে। এই বলে একটি ন্যাকড়ায় বাঁধা পুঁটুলি আমার হাতে দিয়ে বললে, এখন খুলিসনি। সেখানে গিয়ে খুলবি। আমি কিন্তু থাকতে পারিনি বাবু, জাহাজে উঠেই চুপিচুপি খুলে দেখে ফেলেছি। আবার তেমনি করে বেঁধে রেখে দিয়েছি বাবু।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, কি আছে ওতে ? কি দেখলে ?

বাসুদেবের গলার আওয়াজটা আবার ভারি হয়ে এলো। বললে, আগেকার দিনের সোনার একটি অনন্ত, আর দশটি সোনার মোহর।

শীলা ধরে বসলো, চার-চারটে মানুষ তুমি খুন করেছ বললে, তোমার সেই খুনের গল্প বল, শুনবো।

বাসুদেব বললে, না দিদিমণি, আজ আর খুনের গল্প থাক্। এখনও পুরো একটা দিন আর একটা রাত আছি আমরা এই জাহাজে। কাল শোনাব। আজ উঠি ডাক্তারবাবু।

এই বলে অমরনাথের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বাসুদেব শীলার দিকে তাকিয়ে বললে, আসি দিদি! তুমি আমাকে বাঁচালে!

বাসুদেব চলে গেল।

রাত্রিটা নির্বিঘ্নেই কেটে গেছে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করেছে শীলা।

অমরনাথ বলেছিলেন, বেশ লোকটিকে ধরে এনেছিলে। বাসুদেব একটি অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ।

এই নিয়ে কথা উঠলো।

শীলা বললে, কাল ওর মুখ থেকে খুনের গল্প শুনবো।

অমরনাথ বললেন, না না ও-সব গল্প ওর কাছ থেকে শুনতে চেয়ো না। দেখলে না? বলতে চাইলে না। এড়িয়ে চলে গেল।

—বললে না কেন বল তো?

অমরনাথ বললেন, খুন-টুনের ব্যাপারে প্রায়ই দেখা যায় মেয়েছেলে নিয়ে একটা নোংরা কিছু থাকে। তাই হয়ত বলতে চাইলে না তোমার সামনে।

শীলা বললে না, তা বোধ হয় নয়। আমার মনে হয় সে-সব বালাই ওর নেই!

—তাহ'লে বললে না কেন?

—মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান তোমার অনেক বেশি। কাজ কি বাপু, কি বলতে কি বলে ফেলবো, শুনে তুমি হাসবে।

—না হাসবো না। তুমি বল।

শীলা বললে, ওর খুড়ীমার কথা বলতে বলতে দেখলে-না মানুষটা কিরকম অভিভূত হয়ে পড়লো?

—দেখলাম তো! কেঁদে ফেললে।

শীলা বললে, সেই জন্যেই বলতে পারলে না। সে সময় ওর মনের মধ্যে যে-রসের খেলা চলছিল, সেখানে খুনের ব্যাপার বলতে গেলে হয়ত' রসাভাস হতো, তাই বোধ হয় বলতে পারলে না।

অমরনাথ বললেন, তুমি তোমার নিজের মন দিয়ে বিচার করছো ওকে। তুমি হচ্ছ গিয়ে সুরসিকা তরুণী, তোমার মনে চব্বিশ ঘণ্টা রসের খেলা চলছে। ও ও-সব রস-কসের ধার ধারে না।

শীলা বললে, না মশাই না। এ-রস তরুণ-তরুণীর একচেটে সম্পত্তি নয়। বুড়োদের মনেও রসের ঢেউ ওঠে।

অমরনাথ হেসে বললেন, সে রস তখন গেঁজে যায়।

রাত-দুপুরে আর রসের তরঙ্গ বইও না। ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে।

কেবিনের আলোটা নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকার কেবিনের ভেতর আপন-আপন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা বলছিল তারা। শীলার কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে অমরনাথ পাশ ফিরলেন। কিছুক্ষণ পরে চাপা হাসির অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসতেই অমরনাথ বললেন, এখনও ঘুমোওনি ?

শীলা স্পষ্ট বললে, না।

—কি ভাবছো ?

—তাও বলতে হবে ?

—না। শুধু বল তুমি হাসছো কেন ?

শীলা বললে, তোমার কথা শুনে। আমি কি কথা বললাম আর তুমি তাকে কোথায় নামিয়ে আনলে।

অমরনাথ বললেন, একেবারে দেহাশ্রিত আদিরসে। না ?

শীলা বললে, ইয়েস্ স্যার।

অমরনাথ প্রশ্ন করলেন, কেন বলতে পার ?

শীলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, তোমার মন ওই ক্ষেত্রে বিচরণ করছে বলে।

—ওরে বাবা, আমাকে তখন 'প্রফেসার' 'অধ্যাপক'—এমনি সব কথা বলে খোঁচা দিয়েছিলে, আর এখন ? নিজেই যে প্রফেসারি করছো ?

—আজ্ঞে না। প্রফেসারি করিনি, সত্য কথা বলছি।

অমরনাথ বললেন, আর আমি যদি তোমার অবচেতন মনের সত্যকে টেনে বের করে দিই, তুমি হয় ত চম্‌কে উঠবে।

—না। কিছুতেই চমকাবো না। তুমি বল, আমি শুনবো।

—তুমিই চাইছিলে ওর কাছ থেকে ওই সব নোংরা কথা শুনতে। শুনতে তোমার ভাল লাগছিল।

শীলা বললে, ভাল লাগছিল না বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু

কেন জানো ? আমি জানতে চাইছিলাম কেমন করে ওই লোকটা নোংরামির ঊর্দ্ধে উঠে গেল।

অমরনাথ বললেন, উঠে গেছে কি ? সে শিক্ষা-দীক্ষা কোথায় পেলে ও ?

—শিক্ষা-দীক্ষায় এ-কাজ হয় না জামাইবাবু।

—কিসে হয় ?

শীলা অসঙ্কোচে বললে, ভালবাসায়।

শীলাকে চমকাতে গিয়ে অমরনাথের নিজেরই কেমন যেন একটু চমক লাগলো। তাই শীলার কথাটাই তিনি যেন অজান্তেই আর-একবার উচ্চারণ করে বসলেন। বললেন, ভালবাসায় ?

—হ্যাঁ। ভালবাসা পেয়ে আর ভালবাসতে পেরে। পুষ্প-মেয়েটিকে বাসুদেব মনে হয় সত্যিই ভালবেসেছে।

এই পর্যন্ত বলে একটুখানি চুপ করে থেকে শীলা আবার বললে, এবার্ডিন বাজারে গিয়ে আমি কিন্তু চুপিচুপি একদিন দেখে আসব।

—গিয়ে দেখবে হয় ত সব কথাই মিথ্যে। পুষ্প বলে কেউ নেই, আছে হয় ত সেই মাদ্রাজি মেয়েটা—যাকে নিয়ে সে জ্বলেপুড়ে মরছে।

শীলা বললে, হতেও পারে। বিগত জীবনের ইতিহাস তো ওর ভাল নয়। তাই ভেবেছিল হয় ত অমনি এক কলঙ্কিত পুষ্পকে ভালবেসে সে তার অতীত জীবনের কলঙ্ক মুছে ফেলবে।

এই কথা বলেই শীলা যেন নিজের কথার নিজেই প্রতিবাদ করলে। বললে, নাঃ, নতুন একটি পুষ্প রচনা করবার মত কল্পনা-শক্তি ওর নেই। গল্পটা ও তৈরি করেনি। পুষ্প ওর সত্যিই আছে। পুষ্পকে ও দিয়েছে ভালবাসা, আর পুষ্প ওকে দিয়েছে একটি ভালবাসার সন্তান। এই কথা আমাকে অন্তত বিশ্বাস করতে দাও।

অমরনাথ বললেন, দিলাম। তুমি বিশ্বাস কর। কিন্তু আজ

তোমাকে একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করব শীলা!

—কর।

—এই যে ভালবাসার জয়গান তুমি করছ, এ কি তোমার শোনা কথা?

—ক্ষেপেছ? শোনা কথায় বিশ্বাস করব? সে রকম কাঁচা মেয়ে আমি নই।

—বিশ্বাসটা হ'লো কেমন করে?

—অনেক ঘাটের জল খেয়ে।

—অনেক ঘাটের জল তাহ'লে খেয়েছ?

—খেয়েছি, কিন্তু তলিয়ে যাইনি। যে খায়নি, তার দুর্ভাগ্য।

—নিজেকে তাহ'লে তুমি সৌভাগ্যবতী মনে কর?

—করি বই-কি! হাবে-ভাবে চিঠিতে পত্রে এত লোকের এত ভালবাসা পেয়েও নিজেকে দুর্ভাগিনী ভাবি কেমন করে?

—সেই ভালবাসার কিছু যদি সঞ্চয় করে রাখতে, ভবিষ্যতে কাজে লাগতো।

—না। খেলো আর সস্তা জিনিসের ওপর লোভ আমার কোনোকালেই ছিল না, আজও নেই। সেগুলো অত্যন্ত সুলভ।

অমরনাথ বললেন, জবাব আমি পেয়ে গেছি। আমার আর-কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই। যদিই-বা থাকে তো তার জবাব তুমি দেবে না আমি জানি। এবার তুমি দুর্ল্লভের সন্ধান কর। আমি ঘুমোই।

—হ্যাঁ সেই ভালো।

শীলাও ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষের মন! শীলার চোখে আজ ঘুম সহজে এলো না।

তার আগেই অমরনাথের নাক ডেকে উঠলো।

সকালের রৌদ্র এসে পড়েছিল উপসাগরের জলে।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমরনাথ উড়ুক্কু মাছের খেলা দেখছিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ুক্কু মাছ জলের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে খানিক দূরে গিয়ে আবার ডুবে যাচ্ছে জলের তলায়। পালিস করা রূপোর মত সাদা সাদা ছোট ছোট মাছ—তীরের মত উড়ে চলেছে সোজা।

আজকের দিনটা আর রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেই ছুটি।

কাল সকালে জাহাজ গিয়ে পৌঁছোবে পোর্ট ব্লেয়ারে। সেই-খানেই তাঁদের এই জলযাত্রার শেষ।

—নমস্কার ডাক্তারবাবু!

মুখ তুলে তাকাতেই দেখেন, বাসুদেব এসে দাঁড়িয়েছে। সকালেই বোধ করি স্নান করেছে। রঙিন একটি বুশ-সার্ট গায়ে দিয়েছে। পরণে ঢিলে পায়জামা। হাসি হাসি মুখ।

অমরনাথ বললেন, আজ বেশ ভাল আছ মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ বাবু, আপনাদের দয়ায় ভাল হয়ে গেছি।

—দিদিমণির সঙ্গে দেখা হলো?

—হলো। ওইখান থেকেই তো আসছি। দিদিমণি ডাক্তার-খানায় রয়েছে।

অমরনাথ ভেবেছিলেন, বাসুদেব বুঝি তার কেবিনটাকেই ডাক্তারখানা বলছে। কিন্তু সে-ভুল তাঁর ভেঙ্গে গেল—বাসুদেব আবার যখন বললে, ডাক্তারখানার নার্সের সঙ্গে দিদিমণির খুব ভাব হয়ে গেছে তো!

বলেই সে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দিদি-মণির এখনও বিয়ে দেননি ডাক্তারবাবু?

অমরনাথ বললেন, না।

—লেখাপড়া শিখছিল বুঝি?

—হ্যাঁ।

—এবারে বিয়ে দিন বাবু, আর রাখা ঠিক নয়। আমার পুষ্পরও

ঠিক ওই বয়েস। তা দেখুন, কোলে একটি ছেলে এলো। ছেলে না হলে মেয়েদের ভাল দেখায় না। ওরা মায়ের জাত।

অমরনাথ বোধকরি একটু মজা করবার জন্যেই বললেন, আজকালকার মেয়েরা মা হতে চায় না যে!

বাসুদেব ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে লাগলো।—না বাবু না, কখ্‌খনো না। অনেক মেয়ে নাড়াচাড়া করেছি এই বয়সে। ছেলে যারা চায় না তারা ভাল মেয়ে নয়। তারা শুধু ফুর্ত্তি করতে চায়। সেরকম মেয়েও দেখেছি বাবু, যৌবন চলে গেলে তারা একটি ছেলের জন্যে মাথা ঠুকতে থাকে। দিদিমণি তো সে-জাতের মেয়ে নয় বাবু।

অমরনাথ আবার একটু মজা করলেন। বললেন, নাড়াচাড়া করে তো দেখিনি। কোন্‌ জাতের মেয়ে কেমন করে জানবো বল!

—দিদিমণি আপনার কে হয় বাবু?

—আমার শালী হয়।

কথাটা শুনে বাসুদেবের মাথাটা বোধকরি গোলমাল হয়ে গেল। একটুখানি থেমে কি যেন ভাবলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে।

—তাহ'লে আপনার স্ত্রী কোথায়?

অমরনাথ বললেন, স্ত্রী মারা গেছে।

—ও। বলে বাসুদেব চুপ করে গেল। সাগরের জলের দিকে, উড়ুক্কু মাছের দিকে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি আন্দামানে ডাক্তারী করবেন বাবু?

শীলার প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যই বোধকরি সে এই নতুন কথাটা পেড়ে বসলো।

শীলা সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন করবার প্রয়োজন নেই তার। নিশ্চয়ই একটা কিছু সে ভেবে নিয়েছে।

যাই ভাবুক, অমরনাথ তাকে আর ঘাঁটালেন না।

বললেন, কেন? সেখানে আমার ডাক্তারী কি চলবে না?

—না বাবু। আপনি ভুল করলেন।

—কেন ?

—পোর্ট-ব্লেয়ারে অসুখ-বিসুখ হলে আমরা হাসপাতালে চলে যাই। ডাক্তার ডাকি না। আর ডাক্তার সেখানে নেইও।

অমরনাথ বললেন, ধরো, আমি যদি পয়সা কড়ি, না নিই, তাহ'লেও চলবে না ?

—ওরে বাবা, তাহ'লে খুব চলবে। আপনার ওই এক ফোঁটা মিষ্টি ওষুধে যদি রোগ সেরে যায়—এই ধরুন, আমার ছেলেটার যদি অসুখ-বিসুখ করে, তাহ'লে আমি কি ভেবেছেন আপনাকে ছেড়ে ওকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাব ? কখ্‌খনো না।

এই বলে সে অমরনাথের মুখের দিকে একবার তাকালে। দৃষ্টিটা কেমন যেন অন্যরকম। বললে, বুঝেছি বাবু। আপনি পয়সা রোজগারের জন্যে যাচ্ছেন না সেখানে। তা একরকম ভালই করেছেন। তবে জায়গাটা তেমন ভাল নয়। একটু সাবধানে থাকবেন।

অমরনাথ বললেন, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল, যদি কিছু হয়, তোমাকে খবর দেবো।

বাসুদেব এতক্ষণ রেলিংএর ওপর ঝুঁকে পড়ে কথা বলছিল, এই-বার সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, বাস্, শালারা একবার যদি টের পায় যে, বাসু ভট্‌চাজের সঙ্গে আপনার জানা-চেনা আছে, তাহ'লে আর টুঁ শব্দটি করবে না।—ওই তো দিদিমণি আসছে।

শীলা একরকম ছুটতে ছুটতে একটু তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালো।

বাসুদেব বললে, অনেকদিন বাঁচবে দিদিমণি। এক্ষুনি তোমারই কথা হচ্ছিল।

শীলা কিন্তু এসেছিল অমরনাথের কাছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে। এসেই বললে, আচ্ছা জামাইবাবু, তোমার হোমিওপ্যাথি

ওষুধের একটা শিশির সব গ্লবিউলগুলো কেউ যদি একসঙ্গে খেয়ে ফেলে, কি হবে ?

—কেন ? তুমি কি খেয়েছ নাকি ?

—না আমি খাইনি। খেয়েছে একজন।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলে, কেমন করে খেলে ?

—আমি দিয়েছিলাম তোমার সেই 'সি-সিক্‌নেসে'র ওষুধটা। শিশিটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম—এই থেকে চারটি গ্লোবিউল বের করে মুখে ফেলে দিন। বলেই ওপরে উঠে গিয়েছিলাম আমাদের কেবিনের দরজাটা বন্ধ করতে। তারপর কেবিনের দরজায় তালা দিয়ে নীচে নেমে এসে দেখি তিনি খুব ছট্‌ফট্‌ করছেন। সুষমাদিকে জিজ্ঞাসা করতেই বললে, লোকটি নাকি শিশির সব ওষুধটা খেয়ে ফেলেছেন।

—সুষমাদি' এখানে কোথায় পেলে ?

শীলা বললে, জাহাজে যে-ডাক্তারখানা আছে, সেইখানকার নার্স মিস্‌ সুষমা পাল। তুমি এসোই না একবার! লোকটাকে দেখবে এসো। আচ্ছা জামাইবাবু, ভদ্রলোকের কিছু হবে না তো ?

শীলার ব্যাকুলতা দেখে অমরনাথ একটু রসিকতা করলেন। বললেন, হলেই-বা কি করতে পারি বল ?

—বারে, এর 'এাণ্টিডোট্‌' নেই ? তাহ'লে তুমি কিসের ডাক্তার ?

অমরনাথ বললেন, প্রফেশনাল্‌ ডাক্তার তো আমি নই!

—তবে যে শুনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ বাক্স সুদ্ধ খেয়ে ফেললেও কিছু হয় না ?

—কে বললে হয় না ? এক ফোঁটা ওষুধ খাইয়ে তোমাকে আমি অজ্ঞান করে ফেলতে পারি।

—তাহ'লে ওকেও তুমি ভাল করে তুলতে পারো।

অমরনাথ মুখ টিপে একটু হাসলেন। বললেন, কে সে লোকটি—

যার জন্যে তোমার এত ছটফটানি ?

—বা-রে, আমারই জন্যে একটা লোক……

কথাটা শেষ না করেই শীলা পেছন ফিরে তাকালে অমরনাথের মুখের দিকে। জাহাজের এই রেলিং-ঘেরা প্যাসেজটা এত সরু যে দু'জনে পাশাপাশি যাওয়া যায় না। শীলা যাচ্ছিল আগে-আগে, অমরনাথ তার পেছনে। বাসুদেব আসেনি। তার আসবার প্রয়োজন বোধকরি ফুরিয়ে গেছে।

শীলা আবার বললে, হাসছো যে ?

—এমনিই।

অমরনাথ আর-কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

অন্য লোক আসছিল সুমুখের দিক থেকে। তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হলো। শীলাও আর-কিছু বললে না।

জাহাজের ছোট ডাক্তারখানা। পথ চলতে চলতে অমরনাথ দেখেছেন মাত্র, ভেতরে কোনোদিন ঢোকেননি। সেদিন ঢুকতে হলো।

ডাক্তারবাবু ছিলেন না। নার্স মিস্ সুষমা পাল দাঁড়িয়েছিল দোরের কাছে।

শীলা বললে, এই আমার সুষমাদি। জামাইবাবুকে ধরে আনলুম।

অমরনাথকে একটি নমস্কার করে সুষমা হেসে বললে, বসুন।

দিদি হবার বয়স নয়, শীলার চেয়ে দু'এক বছরের বড় হয় ত হবে। আঁট-সাঁট গড়ন, মিষ্টি-মিষ্টি হাসি, বেশ মেয়েটি।

চেয়ার একটি খালি পড়েছিল, অমরনাথ বসলেন।

বসেই বললেন, কোথায় সে ভদ্রলোক—যিনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ শিশিকে শিশি খেয়ে ফেলেছেন ?

হাসতে হাসতে ড্রয়ারটা টেনে হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটি শিশি বের করে সুষমা ডাকলে, শীলা !

ডাক্তারখানার পেছনে গোটা পাঁচ-ছয় লোহার খাটের ওপর

সাদা ধবধবে বিছানা পাতা—জাহাজের হাসপাতাল। শীলা সেই বেডগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছিল। সুষমার হাত থেকে শিশিটা নিয়ে বললে, ওমা, এ কী! ওষুধটা সবই তো রয়েছে!

সুষমা বললে, কিছু খায়নি। খাবে কি! সেরে গিয়েছিল তো! দু'দিন মটকা মেরে পড়েছিল ওইখানে।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় সে?

—শিশিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল।

শীলা বললে, কোথায় গেল বলতে পার?

—তা আমি কেমন করে জানবো?

—কেবিনে না বাঙ্কে?

সুষমা মুখ তুলে তাকালে শীলার মুখের দিকে। বললে, জানি না।

মিনতিকাতর কণ্ঠে শীলা আবার বললে, বল না সুষমাদি।

সুষমা কোনও কথা না বলে সরে গেল সেখান থেকে।

কাছেই বসেছিল অমরনাথ। এইবার উঠে দাঁড়ালেন: বললেন, আমি যাচ্ছি শীলা।

শীলা বললে, হ্যাঁ যাও।

সুষমা বোধকরি অমরনাথের চলে যাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিল। শীলার কাছে এসে বললে, শীলা, জানি না তুমি আমার কথা শুনবে কিনা, তবু বলছি—তুমি যেয়ো না তার কাছে।

—কেন?

—আমার মনে হয় লোকটা ভাল নয়।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কেমন করে বুঝলে?

সুষমা ম্লান একটু হাসলে তার দিকে তাকিয়ে। বললে জানি না।

—আমি কিন্তু চললাম।

—যাও, মর।

ভারি মিষ্টি এক টুকরো হাসি হেসে শীলা বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। সুষমা এসে দাঁড়ালো ডাক্তারখানার দরজায়।

সুমুখে সমুদ্র।

জাহাজ চলেছে পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে। আজ সারাদিন চলবে, সারারাত চলবে, তার পরেই তার চলার শেষ।

জাহাজের দুলুনিটা আবার একটু বেড়েছে বলেই মনে হলো।

দুলুক্। এ-জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বেশ লাগে। শুধু যাওয়া আর আসা।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুষমা ভাবতে লাগলো।

ভাবতে লাগলো ওই ছেলেটির কথা। শীলা যার পেছনে ছুটলো।

ভুল করলে শীলা।

ছেলে ঠিক তাকে বলা যায় না। বয়সটা পঁচিশ-তিরিশের মাঝা-মাঝি। তার নাম সে জানে। চন্দন চ্যাটার্জি। খাতায় লিখতে হয়েছিল নামটা। তার বেশি আর কিছুই সে জানে না।

মাত্র একদিন আগে চন্দন এসে ঢুকলো ডাক্তারখানায়। প্রিয়-দর্শন যুবক। পরণে ট্রপিক্যাল স্যুট। গায়ের রং ফর্সা। চুলগুলো উস্কো খুস্কো। 'সি-সিক্‌নেস্' হয়েছে। ওষুধ চাই।

ডাক্তারবাবু সুষমাকেই বললেন ওষুধ দিতে।

দুটো ট্যাবলেট আর কাঁচের গ্লাসে একগ্লাস জল।

গ্লাসটা দিতে গিয়ে চোখে চোখ পড়ে গেল সুষমার।

চোখ নামিয়ে নেওয়া সুষমার চিরকালের অভ্যাস। কিন্তু কাল কী যে হলো তার, চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না। দু'চার সেকেণ্ড, কি তার চেয়েও কম সময়। মনে হলো যেন চেনা-চেনা মুখ। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলে না কোথায় তাকে দেখেছে।

ওষুধ খেয়েই তার চলে যাবার কথা।

সুষমা ব্যস্ত ছিল অন্য কাজে। ফিরে এসে দেখে, ডাক্তারবাবু

তাকে একটা বেডের ওপর শুইয়ে পরীক্ষা করছেন।

সুষমার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা নয়। তবু একটুখানি থমকে থামলো সে।

বুকে আর পেটে নাকি তার অসহ্য যন্ত্রণা। মাথাটাও ঘুরছে। উঠতে পারছে না। টলে টলে পড়ে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন এইখানে। তারপর সুস্থ হলে উঠে যাবেন।

কিন্তু উঠে সে গেল না। সারাদিন রইলো। সারারাত রইলো। শুধু গ্লুকোজ আর হরলিক্স্ খেয়েই কাটিয়ে দিলে রাতটা।

ডাক্তারবাবু তাঁর যন্ত্র দিয়ে ধরতে পারেননি তাঁর অসুখ। বলেছিলেন, শুধু 'সি-সিক্‌নেস্। কিন্তু সুষমা ঠিক ধরতে পেরেছিল তার চোখের চাউনি দেখে।

অসুস্থতা তার দেহে নয়, মনে।

মানসিক অসুস্থ লোকদের এখানে এরকমভাবে শুইয়ে রাখা চলে না। সুষমা তা বেশ ভালো করেই জানে। তাড়িয়ে সে তাকে দিতে পারতো—চন্দন যদি অভদ্র হতো। কিন্তু অভদ্রতার লেশ মাত্র ছিল না তার আচারে-আচরণে।

শুধু তার চোখে-মুখে সর্ব্ব দেহে ছিল একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ।

এরকম পুরুষ সুষমা দেখেছে। দেখেছে যখন সে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী। সুশোভন রায়। সেও ছিল ছাত্র। দেখতে যে খুব সুন্দর ছিল তা নয়। বুকের ছাতি ছিল চওড়া, হাতের কব্জি ছিল শক্ত, আর কোথায় যে কি ছিল—চোখে দেখা যেতো না, কিন্তু সুশোভন রায়ের একটুখানি কৃপাদৃষ্টিকে অভিনন্দিত করবার জন্য মেয়েদের মধ্যে রেষারেষির অন্ত ছিল না।

সুশোভন রায়ের সমগোত্র এই চন্দন চ্যাটার্জি।

সুশোভনের সঙ্গে সুষমার পরিচয় হয়েছিল মাত্র কয়েকদিনের জন্য।

তার সেই ক্ষণকালের পরিচয়কেই চিরকালের করে রাখতে চেয়েছিল সুশোভন রায়। কিন্তু ভগবান রক্ষা করেছিলেন কুমারী সুষমা পালকে। তার মাসীমার এক মেয়ের বিয়েতে হঠাৎ তাকে চলে যেতে হয়েছিল দার্জিলিং। সেখানে গিয়ে পড়ে গেল অসুখে। ফিরে যখন এলো মাসখানেক পরে, সুশোভন তখন বাসন্তী ব্যানার্জির মত এক বোকা মেয়ের পাল্লায় পড়ে কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

মেয়েদের শত্রু এই সুশোভন রায়কে হাড়ে হাড়ে চিনেছিল বলেই চন্দন চ্যাটার্জিকে চিনতে সুষমার দেরি হয়নি।

চিনতে পেরেছিল বলেই নিজের দুর্ব্বলতাকে সম্বরণ করেছিল সুষমা।

শীলার জীবনে সুশোভনের আবির্ভাব হয়নি নিশ্চয়ই। হলে আর সে এমন করে জুটতো না চন্দন চ্যাটার্জির সন্ধানে।

কি যে হবে তার কে জানে!

শীলার সঙ্গে ক'দিনেরই-বা পরিচয়! জীবনে তার সঙ্গে হয়ত আর দেখাই হবে না।

ভারি মজার তার এই জাহাজের চাকরিটা।

কত রকমের কত মানুষ আসে। চারটি দিন আর চারটি রাত্রির জন্য থাকে এই জাহাজে। তারপর নেমে যায়। একবার যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকে হয় ত সারাজীবনেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বন্দর থেকে বন্দরে যাওয়া আর আসা।

খিদিরপুর থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের চাথাম্। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কার-নিকোবর। নিকোবর থেকে মাদ্রাজ। আবার মাদ্রাজ থেকে পোর্ট ব্লেয়ার, তারপর আবার খিদিরপুর।

এমনি যাওয়া-আসার পথে বাঙ্গালী মেয়ের মুখ খুব কমই দেখতে পায় সুষমা। এক-আধজন যাদের দেখে চারিদিকে অথৈ

জলের মাঝখানে এই জাহাজের আশ্রয়টিতে তাদের আপন জন বলে কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করে।

শীলার সঙ্গে তাই সে নিজে থেকে পরিচয় করেছিল।

বড় ভাল মেয়ে শীলা।

ডাক্তারবাবু এলেন। সুষমা তাকে কি যেন একটা কথা বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরবাবু এসেছেন। ভদ্রলোকের বয়স সত্তোর পার হয়ে গেছে। কঙ্কালসার বৃদ্ধ। আন্দামানে তাঁর এক ভাইপো কি একটা চাকরি করে। সেখানে তিনি চেঞ্জে যাচ্ছেন। শরীরটা সারাবার জন্যে। রোজ সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা ডাক্তারখানায় এসে বসেন। প্রত্যহ একটি করে নতুন অসুখের কথা বলেন ডাক্তারবাবুকে। বলেন, এই অসুখটি আমার সারিয়ে দিন ডাক্তাবাবু।

ডাক্তারবাবু কোনোদিন একমাত্রা সিরাপ খেতে দেন।

কোনোদিন একটা কাগজে লেখেন, 'একোয়া টাইকোটিস্'।

লিখে সেই কাগজটি চুপিচুপি সুষমার হাতে দিয়ে বলেন, এই ওষুধটা তৈরি করে এঁকে একমাত্রা খাইয়ে দাও।

সুষমা ডাক্তারখানায় ঢুকে ডাক্তারবাবুর আদেশের অপেক্ষা করছিল, এমন সময় সিদ্ধেশ্বরবাবু নিজেই এসে দাঁড়ালেন সুষমার কাছে। গলাটা খাটো করে বললেন, তোমার ডাক্তারখানায় ব্র্যাণ্ডি থাকে তো আমাকে বেশ বড় করে এক ডোজ্ দাও তো মা!

সুষমা বললে, ডাক্তারবাবুকে বলুন।

—ও রে বাবা, এক্ষুনি খ্যাক্ করে উঠবে। তুমি দেবে তো দাও!

—না সিদ্ধেশ্বরবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, যাক্‌গে, মরুক্‌গে, দিতে যখন পারবেই না···তোমাকে আর-একটা কথা জিজ্ঞাসা করি চুপি চুপি। ভ্যাখো, ওই যে মেয়েটি তোমার কাছে আসে—ওই যে যুবতী মেয়েটি খুব

সুন্দরী গো, চন্‌মন্ চন্‌মন্ করে, বেশ ডাগর ডাগর চোখ, তোমাদের সিনেমার মধুবালা-মধুবালা চেহারা—

সুষমা তাঁকে থামিয়ে দিলে।—বলুন বলুন, বুঝেছি। আপনি শীলার কথা বলছেন।

—ও। ওর নাম বুঝি শীলা? তা মেয়েটির স্বভাব-চরিত্তির কেমন বল দেখি?

সুষমার হাসি পেল। সত্তোর বছরের অস্থিচর্ম্মসার বুড়ো শীলার স্বভাব চরিত্রের খবর নিতে চায়!

বললে, আপনার সে-সব খবরে দরকার কি?

সিদ্ধেশ্বরবাবু কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, না না—আমার দরকার মানে ওরকম সুন্দরী মেয়ে তো সচরাচর দেখা যায় না, তাই বলছিলাম—কিউরিওসিটি, মানে মনের কৌতূহল আর কি···মেয়েটা সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছে হচ্ছে।

সুষমা এইবার হেসেই ফেললে। বললে, ধরুন, ওর স্বভাব চরিত্র খুবই খারাপ। এ-কথা জেনেই-বা আপনার কি হবে?

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, ডেকে সাবধান করে দেবো। মেয়েটা কি করছে জানো?

—কি করছে?

—আমাদের 'বাঙ্ক' মানে বুঝতেই পারছো—জাহাজের একেবারে নীচের তলা। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—দিনের বেলা আলো জ্বালতে হয়। সেই অন্ধকারে প্রত্যেকটি সিট্ দেখে দেখে বেড়াচ্ছে। কাকে যেন খুঁজছে। দেখলাম একবার হোঁচট্ খেয়ে পড়লো। ভাবলাম একবার তুলে দিইগে, তারপর ভাবলাম, না থাক্। মজাটি বুঝুক্। কত রকমের কত বজ্জাত লোক ওখানে আছে জানো? অন্ধকারে কি কাণ্ড যে করে দেবে···

সুষমা বললে, করুক্। আপনি ওর দিকে তাকাবেন না।

—আমার বয়ে গেছে ! আমি কি ওর দিকে তাকিয়েছি নাকি ? আমার শুধু ভয় হচ্ছে—ওর সঙ্গে সঙ্গে যে-লোকটা যাচ্ছে সেই লোকটার জন্যে।

সুষমা জিজ্ঞাসা করলে, কে সে ?

—আমাদেরই 'বাঙ্কের' এক-ব্যাটা প্যাসেঞ্জার। একটা এক্স-কন্‌ভিক্‌ট। খুনে আসামী—ব্যাটার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল, এখন ছাড়া পেয়ে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তার নিজের মুখ থেকে শুনেছি। সে ব্যাটা ঠিক তার পিছু নিয়েছে।

সুষমার আর ভাল লাগছিল না শুনতে। বললে, নিক্‌গে।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ। নিক্‌গে। তবে আমার কর্তব্য তোমাকে বলে দেওয়া। তাই বলে দিলাম। তুমি একটু সাবধান করে দিও।

সুষমা বললে, আমার কথা ও শুনবে কেন ? আর কতক্ষণের জন্যেই বা আছি একসঙ্গে ! আজকের রাতটা শেষ হলেই তো কে কোন্‌দিকে চলে যাবে—

সিদ্ধেশ্বরবাবুর হঠাৎ বোধকরি যাত্রাশেষের কথাটা মনে পড়ে গেল। বললেন, তাও তো বটে ! কাল সকালেই তো আন্দামান ! এ ক'টা দিন বেশ কাটলো কিন্তু !

খাবারের ঘণ্টা পড়লো।

সুষমা জিজ্ঞাসা করলে, আপনি খেয়েছেন ?

সিদ্ধেশ্বরবাবু তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছিলেন। শীলার জন্য দুশ্চিন্তায় তাঁর খাবারের কথাটাও মনে ছিল না। এতক্ষণে চমক ভাঙলো। বললেন, তাও তো বটে ! টিকিট একটা করে রেখেছি, কিন্তু খেতে ইচ্ছে করে না। তোমাদের জাহাজের খাবার খুব খারাপ।

—কি আর করবেন। যান, আপনি উঠুন।

এই বলে সিদ্ধেশ্বরবাবুকে তুলে দিয়ে সুষমা বোধকরি স্নান

করতে গেল।

—নাঃ, মানুষের উপকার করতে নেই।

এই কথা বলতে বলতে শীলা তাদের কেবিনে ঢুকলো।

'বয়' তার আগেই টেবিলের ওপর দু'জনের খাবার চাপা দিয়ে রেখে গেছে। অমরনাথ বসে বসে বই পড়ছেন।

—তুমি খেয়ে নিলেই তো পারতে।

—কই আর খেলাম!

—আমার জন্যে দেরি হয়ে গেল তো?

—দেরি আর এমন কি হলো?

বলেই তিনি বইখানা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কাজ হলো?

—কি কাজ?

—যে কাজের জন্যে গিয়েছিলে।

—নাঃ, লোকটাকে দেখতে পেলাম না।

—দেখতে পেলে কি করতে? মারতে?

হাতটা ধুয়ে খাবারের ডিস দুটো সাজাতে সাজাতে ফিক্ করে হেসে ফেললে শীলা।—ঠাট্টা করছ। কর!

—না ঠাট্টা করিনি। যে রকমভাবে গেলে···

দু'জনেই খেতে বসলো। শীলা বললে, আমার যাওয়াটাই শুধু দেখলে। লোকটা আমার সঙ্গে কিরকম রসিকতা করলে—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলেন না অমরনাথ। বললেন, তোমাকে দেখে যদি অরসিকা মনে হতো, তাহ'লে বোধ হয় সে রসিকতা করতো না।

শীলা আর কোনও কথা বললে না। খেতে খেতে কি যেন ভাবতে লাগলো।

অমরনাথ বললেন, অত ভাববার দরকার নেই। সবাই আমরা একই জায়গার যাত্রী। দেখা তার সঙ্গে তোমার হবেই।

শীলা বললে, দেখা করবার জন্যে আমি যেন মরে যাচ্ছি ?

কিন্তু মরে না যাবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। খাওয়া-দাওয়ার পর শীলা আবার বেরিয়ে পড়লো বোধকরি তারই সন্ধানে। অমরনাথ বাধা দিলেন না। মনে মনে একবার শুধু হাসলেন।

এক নম্বর, দু' নম্বর বাঙ্কের দুটো দিকই তার দেখা হয়ে গেছে। এবার বাকি শুধু তিন আর চার।

তিন নম্বর বাঙ্কের দোরে গিয়ে শীলা থমকে থামলো। সিঁড়ি দিয়ে নীচে গিয়ে নামতে হবে জাহাজের খোলের তলায়। ওদিকে কিচেন্ থেকে একটা বিজাতীয় বিশ্রী গন্ধ আসছে। যতবার এই পথ দিয়ে সে যাওয়া আসা করেছে, ততবার এই গন্ধটা তার নাকে ঢুকেছে : হাজার হাজার বাঙ্কের যাত্রী ক্যান্টিনে বসে বসে এইখানকার খাবার কিনে কিনে খায়। খেতে বাধ্য হয়। এ-ছাড়া আর অন্য ব্যবস্থা নেই।

শীলার হঠাৎ কেমন যেন মনে হলো—যার সন্ধানে এখানে সে এসেছে, সে-লোকটি বাঙ্কের যাত্রী নয়।

নীচে নামবে কিনা ভাবছে, এমন সময় বাসুদেব এসে দাঁড়ালো তার কাছে।

—একটু দেরি হয়ে গেল দিদিমণি, ক্যান্টিনের ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করছিলাম। পয়সা নিয়ে এমন খাবার দেয় যা মুখে দেওয়া যায় না।

শীলা বললে, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কোনও লাভ হবে না বাসুদেব। ও চাকরি করে।

—ওপরঅলাকেও বলেছি দিদিমণি, সেও চাকরি করে। তারও

পয়সার দরকার। সেও চুপ করে থাকে।

কয়েকজন লোক উঠে আসছিল সিঁড়ি দিয়ে। তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াতে হলো।

বাসুদেব বললে, এসো দিদিমণি, এই বেঞ্চিটাতে একটু বোসো। এখন সব চান-খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে! যাকে খুঁজছো এখন তাকে না পেতেও পারো। একটু পরে যাবে।

ফাঁকা বেঞ্চির ওপর এসে বসলো শীলা। সামনের বেঞ্চিটাতে মুখোমুখি বসলো বাসুদেব।

শীলা বললে, আমি যাকে খুঁজছি, সে বোধ হয় বাঙ্কের প্যাসেঞ্জার নয়।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করলে, সে কি গভরমেণ্টের কাজকর্ম্ম কিছু করে?

—কেন বল তো?

বাসুদেব বললে, গভরমেণ্টের কাজ যদি করে তাহ'লে সে এখানে নেই। আজকাল ওদের হাতেই টাকা। দেড়শ' টাকায় টিকিট কেটে কেবিনে চলে গেছে।

—আর যদি গভর্ণমেণ্টের কাজ না করে?

—তাহ'লে এইখানেই আছে!

হাসতে হাসতে শীলা জিজ্ঞাসা করলে, গভর্ণমেণ্টের ওপর তোমার এত রাগ কেন বাসুদেব? এখন তো গভর্ণমেণ্ট আমাদের নিজেদের।

বাসুদেব বললে, সেইজন্যেই তো মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না দিদিমণি। বলতে লজ্জা করে। কিন্তু আর বোধহয় লজ্জাশরম কিছু থাকে না। জিনিসপত্রের দাম দিন-দিন বেড়েই চলেছে। ভাত কাপড় জোগাতেই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে।

শীলা বললে, বেশিদিন এরকম থাকবে না। দেশকে গড়ে তুলতে হলে এরকম কষ্ট কিছুদিন সহ্য করতেই হয়।

—কিছুদিন মানে? আজ বারো বছর তো হয়ে গেল। যাবজ্জীবন কয়েদের মেয়াদ তো বারো বছর।

এই বলে একটুখানি থেমেই বাসুদেব বললে, লেখাপড়াও ভাল শিখিনি, তার ওপর আন্দামানে বসে কিছু বুঝতেও পারি না। এবারে কলকাতা গিয়ে শুনলাম নাকি আমাদের দেশটাকে সুন্দর করে মেরামত করবার জন্যে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ধার নেওয়া হচ্ছে। তাহ'লে আমার এক ঠাকুর্দার একটা গল্প বলি, শোন দিদিমণি। ভারি বুদ্ধি ছিল আমার ঠাকুর্দার। ঠাকুর্দার ছেলে ছিল অনেকগুলো। স্বভাব চরিত্তির কিন্তু কারও ভাল ছিল না। সব ক'টা ছেলেই জোচ্চোর-বাটপাড়ের একশেষ। চুরি জোচ্চোরি করে' রোজগার তারা করতো অনেক, কিন্তু অভাব কোনোদিন তাদের ঘুচতো না। ঠাকুর্দা বললেন, দাঁড়া, তোদের একটা পাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তখন আর অভাব বলতে কিছু থাকবে না। আমাদের বাড়ীর পাশে ছিল এক মাড়োয়ারী। খুব বড়লোক। ঠাকুর্দার সঙ্গে তার ছিল খুব ভাব। ঠাকুরদা তার কাছ থেকে মোটা টাকা ধার নিয়ে প্রথমেই ডাকলে জনকতক ঠিকাদার। ঠিকাদার কি হবে? না, মস্ত বড় ইমারত তৈরি হবে। তার একদিকে হবে কারখানা আর একদিকে ছেলেরা থাকবে, আর খানিকটা ভাড়া দেবে। শালা ঠিকাদাররা তো প্রথমেই মারলে অর্দ্ধেক টাকা। তারপর চললো হৈ হৈ কাণ্ড-কারখানা। ঠাকুর্দা গেলেন মরে। আমার বাবা-কাকাদের তখন পায় কে? রাজা-মহারাজাই-বা কে, তারাই-বা কে? তাদের সঙ্গে যারা জুটলো তারাও একহাত মেরে নিলে। যেন লুটের কারবার। দেখতে দেখতে সব একদিন হরির লুট হয়ে গেল। চোর-ছ্যাঁচড়দের হাতে টাকা-পয়সা পড়লে এমনিই হয়। কিন্তু মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের দেনা তখন সুদে-আসলে ফুলে-ফেঁপে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। এইবার তিনি এসে হাত পাতলেন। সেই হাতের ভেতর সব-কিছু

ঢুকে গেল। আমার বাবা তখন মরে বেঁচেছে। কাকারা হলো পথের ভিখিরী। আমি সেই তাদেরই বংশধর। কাকার বাড়ীতে মানুষ। চোর-ছ্যাঁচড়ের ছেলে হলাম গুণ্ডা আর খুনেরা।

শীলা তাকে আর বেশি বাড়তে দিলে না। বললে, থাক্। দেশের কথা আমি অনেক শুনেছি। বলতে হয় তো তোমার কথা বল।

—আমার কথা তো বলেছি।

—সে কথা নয়, তোমার খুন করার কথা : সেদিন যা শুনতে চেয়েছিলাম।

বাসুদেব বললে, তার আগে তোমাকে একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করব দিদিমণি, কিছু মনে কোরো না।

—না কিছু মনে করব না। তুমি বল কি বলবে।

—তুমি এখনও বিয়ে করনি কেন?

—আমার খুশী। আমার ইচ্ছে।

—ভগ্নিপতির সঙ্গে একঘরে—

—থাক্ আর শুনতে চাই না। চল এবার দেখি। সবাই এসে গেছে। এই বলে শীলা উঠে দাঁড়ালো।

বাসুদেবও উঠে দাঁড়ালো। বললে, আমার কথাটার জবাব দিলে না দিদিমণি?

শীলা বললে, না। ওর জবাব নেই। আমি খুব খারাপ মেয়ে—এই কথা ভেবে যদি সুখ পাও তো তাই ভেবে নাও।

—না দিদিমণি, আমার জীবনে এমন একসময় ছিল, যখন তাই ভেবে সুখ পেতুম, এখন আর পাই না। এখন কষ্ট হয়।

তারা দু'জনেই সিঁড়ি ধরে আগে পিছে বাঙ্কে গিয়ে নামলো।

ওরা যখন বাঙ্কে, ওদিকে তখন অমরনাথের কেবিনের দরজায় উঁকি মেরে চন্দন বললে, ভেতরে আসতে পারি?

অমরনাথ মুখ তুলে তাকিয়েই দেখলেন, সাহেবী পোষাক পরা

সুন্দর একজন যুবক। বললেন, আসুন।

চন্দন চ্যাটার্জি ভেতরে ঢুকলো।—নমস্কার!

—নমস্কার! অমরনাথ চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বলেন, বসুন।

চন্দন বললে, বসবার জন্যে আসিনি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

বলতে বলতে বসলো! বসেই বললে, আপনিই কি হোমিওপ্যাথ?

এতক্ষণে অমরনাথ বুঝলেন ছেলেটি কে। না বুঝবার মত বোকা তিনি ন'ন্। এরই পেছনে ছুটেছে শীলা।

তা ছোটবার মত চেহারা বটে! চোখের দিকে তাকানো যায় না।

অমরনাথ বললেন, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার-টাক্তার নই। হোমিওপ্যাথির ষ্টুডেণ্ট্ বলতে পারেন।

বড় সুন্দর একটি হাসি হেসে চন্দন বললে, বা, ডাক্তার ন'ন্ অথচ আন্দামানে যাচ্ছেন প্র্যাক্‌টিস্ করতে, তা কেমন করে হয়?

—না না আন্দামানে আমি প্র্যাক্‌টিস্ করতে যাচ্ছি না তো! শীলা যাচ্ছে হাঁসপাতালের নার্স হয়ে।

বাস্! চন্দনের কাজ হয়ে গেছে।

চন্দন বললে, ও।

বলেই সে উঠে দাঁড়ালো।—আমি শুধু জানতে এসেছিলাম—একটি মেয়ে আমাকে একশিশি ওষুধ দিয়েছিলেন, সেটা আপনি ফেরত পেয়েছেন কিনা!

অমরনাথ বললেন, পেয়েছি।

আবার একটি নমস্কার করে চন্দন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অমরনাথ একটু যেন বিস্মিতই হলেন।

এ তো শুভলক্ষণ বলে মনে হচ্ছে না!

শীলার জন্য অপেক্ষা করলে না, শীলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু

জানতেও চাইলে না, এলো আর চলে গেল, তবে কি আলেয়ার পেছনে ছুটছে শীলা ?

হাসপাতালের নার্স শুনে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল কিনা তাই-বা কে জানে !

ছি ছি প্রথম পরিচয়েই 'নার্স' কথাটা বলা বোধ হয় তাঁর উচিত হলো না।

এমনি সব নানান্ কথা ভাবছেন অমরনাথ, এমন সময় শীলা ফিরে এলো।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, পেলে ?

—কি ?

—যা খুঁজছিলে ? পরশ-পাথর ?

—আবার ঠাট্টা করছো ?

অমরনাথ বললেন, বেশ, আর-কিছু বলব না তাহ'লে। চুপ করে রইলাম।

শীলা বললে, হ্যাঁ, চুপ করেই থাকো।

অমরনাথ কিন্তু সত্যিই চুপ করে রইলেন।

চুপ করে হয় ত থাকতেন না, কিন্তু চন্দনকে দেখে আগ্রহটা একতরফা বলেই তাঁর মনে হয়েছে। প্রেমের এই লুকোচুরি খেলায় একতরফা আগ্রহের কোনও মূল্য নেই—এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

ভেবেছিলেন, একটা রাত্রি পার হোক্, কাল সকালেই হয় ত শীলার মন থেকে সব আগ্রহই মুছে যাবে।

কিন্তু জীবনের অদৃশ্য দেবতা তখন অলক্ষ্যে থেকে হেসেছিলেন কিনা তাই-বা কে জানে !

শেষ রাত্রি প্রভাত হলো।

খবর পাওয়া গেল, বেলা দশটার ভেতরেই জাহাজ চ্যাথাম্ বন্দরে গিয়ে লাগবে। পোর্ট ব্লেয়ারের চ্যাথাম্ জাহাজ-ঘাটা।

যাত্রীদের ভেতর সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

গোলমাল যেন নীচে থেকেই বেশি আসছে। লটবহর বাঁধা ছাঁদা করে সবাই যেন জাহাজ থেকে নেমে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

ন'টা বাজতে না বাজতেই অনেকেই 'ডেকে' এসে দাঁড়ালো। রেলিং ধরে সবাই তাকিয়ে আছে সুমুখের দিকে। কে যেন একটা পাখী দেখেছে। এবার নিশ্চয়ই মাটি দেখা যাবে, গাছ দেখা যাবে। মাটির মানুষ, মাটি দেখবার জন্যে যেন পাগল হয়ে গেছে।

প্রথমে পাখীর সংখ্যা বাড়লো।

তারপর এলো ঝাঁকে ঝাঁকে জল-পায়রা।

তারপর দক্ষিণ সমুদ্রের জলের সঙ্গে যেখানে আকাশ এসে মিশেছে, তারই কোল ঘেঁষে দেখা গেল, সবুজ গাছের সারি, আর তীরের মাটিতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মাথায় সাদা সাদা ফেনা।

দূরবীণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে যিনি দেখছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, আমি আন্দামানের কয়েকটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি—স্পষ্ট পরিষ্কার।

—আর কি দেখতে পাচ্ছেন? কে একজন জিজ্ঞাসা করলে।

—ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ের ওপর বাড়ী, নারকেল গাছ। সব—সব দেখতে পাচ্ছি।

ধীরে ধীরে জাহাজ এগিয়ে চললো। ধীরে ধীরে সবই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো সবারই চোখের সামনে।

—ওই সেলুলার জেল!

অমরনাথ কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন দেখবার জন্যে।

শীলা একটা 'হোল্ড-অলে' নিজের বিছানাটা বেঁধে অমরনাথের বিছানাটা বেঁধে নিচ্ছিল। বললে, আমি দেখব না? এই রইলো তোমার বিছানা—

এই বলে সব কিছু তেমনি অগোছালো ফেলে দিয়ে সেও ছুটে বেরিয়ে গেল। অমরনাথের পাশে গিয়ে 'ডেকে'র রেলিং ধরে

দাঁড়িয়ে পড়লো !—বেশ মানুষ যা-হোক! নিজে কেমন ছুটে বেরিয়ে এলো! আমাকে যেন দেখতে নেই।

অমরনাথ হাসলেন। বললেন, এই তো নিজে থেকেই ঝপ্ করে বেরিয়ে এলে!

—একবার ডাকলে না তো?

অমরনাথ বললেন, ভেবেছিলাম, দেখবার মত জায়গা কিছু আসুক্, এলে ডাকবো।

—এই তো এসেছে। এই তো বেশ দেখছি।

—না, এখনও আসেনি। এখনও অনেক দূর। এখনও ঝাপ্সা।

—তা হোক্!

—না, তা-হোক্ বলে প্রথম দর্শনের রোমান্সটাকে নষ্ট কোরো না। দূরে থেকে অনেক অসুন্দরকে সুন্দর দেখায়।

—এখানেও দর্শন-তত্ত্ব?

অমরনাথ বললেন, হ্যাঁ গো সুন্দরী, দর্শনতত্ত্বই জীবনের অনেকখানি।

এই বলে শীলার কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, এখন যাও। জিনিসপত্র ঠিক করে নাওগে। ঠিক সময় আমি তোমাকে ডাকবো।

শীলা বললে, ওইখানেই তো যাচ্ছি। এ আর দেখবো কি?

চলে যাচ্ছিল শীলা। অমরনাথ বললেন, দেখবে বই কি! নিশ্চয়ই দেখবে। দেখে যেন বলতে পার—আমার নয়ন ভোলানো এলে! আমার ভুবন-ভোলানো এলে!

শীলা একটু হেসে কেবিনে গিয়ে ঢুকলো।

অমরনাথ তাকে ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিলেন। শীলা দেখতে পায়নি, কিন্তু অমরনাথ দেখেছিলেন—জাহাজের একেবারে শেষ প্রান্তে ডেকের ওপর লোকজনের ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছোকরাটি। সেই চন্দন চ্যাটার্জি। এদিকে একবার সে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

॥ তিন ॥

পোর্ট ব্লেয়ারের জেটিতে এসে জাহাজ ভিড়েছে। কাঠের সিঁড়ি লেগেছে জাহাজের গায়ে।

অমরনাথ বললেন, নীচের যাত্রীরা আগে নেমে যাক্। আমরা পরে নামবো।

শীলার কিন্তু মন পড়ে আছে সেই মানুষটির জন্যে। এই সময় তাকেও নামতে হবে জাহাজ থেকে। একটু লক্ষ্য রাখলে দেখা তার পাবেই।

অমরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন সেকথা। বললেন, তাহ'লে তুমি একটা কাজ কর শীলা। একজন কুলি তো আমাদের জিনিসপত্র নামাতে পারবে না। লোকজনের ভিড় একটু কমুক্, কুলিটাকে নিয়ে তুমি আগে নেমে যাও। জিনিসগুলো আগলে দাঁড়াও গিয়ে। আমি এইখানে থাকি।

সেই ভালো। শীলা বললে, মেডিকেল অফিসারকে একটা চিঠিও লিখেছি, টেলিগ্রামও করেছি. এখানকার কিছুই তো জানি না। আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই করবেন।

—একটা নার্সের জন্য অতটা কষ্ট স্বীকার যদি নাও করেন, যাহোক্ একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব। চল।

কুলির মাথায় কিছু মাল চড়িয়ে দিয়ে শীলা আগেই নেমে গেল।

কুলিকে আবার জাহাজে পাঠিয়ে দিয়ে শীলা দাঁড়িয়ে রইলো জেটির ওপর। বড় বড় টিনের সেড। একদিকে মস্ত বড় একটা 'শ-মিল্' চলছে। আর একদিকে একটা খাবারের দোকান, জাহাজের আপিস।

দুটো পাহাড়ের মাঝখানে সমুদ্র যেন এখানে নিতান্ত ছোট হয়ে

এসে ঢুকেছে। বাঁধা পড়েছে মাটির বন্ধনে। স্ফটিকস্বচ্ছ সাগরের জলে আর সে তরঙ্গ নেই। সুমুখে দেখা যাচ্ছে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরে সাউথ পয়েন্টের পাশ দিয়ে এই জল গিয়ে পড়েছে সেই নিঃসীম সমুদ্রে—যার ওপর ভাসতে ভাসতে তারা এলো স্বজন বান্ধবহীন অচেনা অজানা এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে।

পাহাড়ের ওপর ছোট বড় নানারকমের কাঠের বাড়ী, সবুজ গাছের সারি, কত রকমের কত মানুষ! দেখতে মন্দ লাগছে না শীলার।

জায়গাটা কত বড় কিছুই সে জানে না। শুধু জানে প্রায় দু'শ এমনি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে এই আন্দামান। এর ভেতর কোথায় আছে তার ভাই বিশ্বনাথ! তাকেই খুঁজে বের করবার জন্যে সে এখানে এসেছে। ভরসা শুধু তার ভগ্নিপতি অমরনাথ!

বিশ্বনাথের কথাটা মনে পড়তেই শীলা যেন সব কিছু ভুলে গেল। শীতকালের সূর্য্য উঠেছে মাথার ওপর। রোদটা তার গায়ে মুখে এসে লাগছে। কতকগুলো লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কোনোদিকে তার লক্ষ্য নেই। মুহূর্তেই সে যেন তন্ময় হয়ে গেল তার নিজের চিন্তায়।

জাহাজ থেকে লোকজন তখনও নামছে।

আর-এক দফা মাল নামিয়ে দিয়ে কুলিটা আবার জাহাজে উঠে গেল। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বড় বাক্সটা তখনও নামেনি। সেইটে সঙ্গে নিয়ে বোধকরি অমরনাথ নেমে আসবেন।

শীলার আবার আর এক ভাবনা। হাসপাতাল থেকে লোকজন এখনও কেউ এলো না। আসবে কিনা তারও কোন স্থিরতা নেই। হাসপাতাল এখান থেকে কত দূর, সেটা না হয় কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই টের পাবে। কিন্তু এই এত এত জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে তারা যাবে কেমন করে?

একজন কুলি দাঁড়িয়ে ছিল, শীলা তাকে ডাকলে হাতের ইসারায়।

লোকটা কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলে, হাসপাতাল এখান থেকে কতদূর ?

—বহুৎ দূর।

—এখানে গাড়ী পাওয়া যাবে ? ট্যাক্সি ?

লোকটা স্মুখে তাকিয়ে দেখলে একবার। তারপর মাথা নেড়ে বললে, নেহি মাজি, সব চলা গয়া।

—তুমি একটা গাড়ী ডেকে দিতে পার ? তোমাকে বকশিস দেবো।

এমন সময় যে-লোকটি তাদের পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল তার দিকে তাকাতেই শীলা যেন অকূলে কূল পেয়ে গেল। আরে, এই তো সেই !

—শুনুন !

চন্দন ফিরে তাকালো,। চোখে সেই দৃষ্টি ! মুখে সেই হাসি ! শীলা বললে, চিনতে পারছেন না বুঝি ?

—না।

মুখে আবার সেই হাসি ! এ 'না'-এর অর্থ শীলা বোঝে।

—আমার সঙ্গে তখন ওরকম রসিকতা করলেন কেন ?

চন্দন বললে, আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। সে আমি নই, অন্য কেউ হবে।

শীলা এবার না হেসে থাকতে পারলে না। বললে, আপনাকে কী খোঁজাই-না খুঁজেছি।

—কেন ? শাস্তি দেবেন বলে ?

শীলা বললে, হ্যাঁ।

—তাই বোধ হয় নিজেই শাস্তি পাচ্ছেন।

—কী শাস্তি ?

—এই তো, গাড়ী পাচ্ছেন না।

শীলা হাসতে হাসতে একপা এগিয়ে গেল তার দিকে !

বললে, সত্যিই। সব গাড়ীগুলো চলে গেছে। একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?

চন্দন বললে, ওই অত মালপত্তর আমি একা নিয়ে যেতে পারব না।

—তাই যেন কেউ বলছে আপনাকে ? একটা গাড়ী ঠিক করে দিতে পারেন ?

—না, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে।

—কোথায় যাবেন আপনি ?

—অনেক দূর। লং আইল্যাণ্ড।

এই বলে চন্দন চট্ করে মুখ ফিরিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।

বাঃ, বেশ লোক তো !

শীলা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সেই দিকে।

—কি হলো ?

কুলি নিয়ে অমরনাথ নেমে আসছেন জাহাজ থেকে।

শীলা সেইদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, কিছু না।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, উনি কোথায় গেলেন ?

শীলা বললে, লং আইল্যাণ্ড।

বলেই আর একবার তাকিয়ে দেখলে, পথের বাঁকে সে তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অমরনাথ দেখলেন, হাসপাতাল থেকে কেউ আসেনি। আসবার আশাও আর নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, এখান থেকে গাড়ী-টাড়ি কিছু পাওয়া যাবে ? জিজ্ঞাসা করেছ কাউকে ?

শীলা বললে, না। গাড়ী পাবার কোনও আশা তো দেখছি না।

—হাসপাতাল কত দূর এখান থেকে ?

—বলছে তো অনেক দূর।

—হাঁটতে পারবে ?

শীলা বললে, পারতেই হবে।

অমরনাথ বললেন, তারপর আহার এবং বাসস্থান।

শীলা ম্লান একটুখানি হাসলে শুধু।

কুলি দাঁড়িয়েছিল পয়সার জন্যে। অমরনাথ তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, হাসপাতাল পর্য্যন্ত এই সব জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। তিন জন কুলি লাগবে। কত নেবে বল।

তারা নিয়ে যেতে পারবে না। অন্য লোক ডেকে দিলে।

তাদের সঙ্গে দরদস্তুর আর কিছুতেই শেষ হতে চায় না! তারা বুঝতে পেরেছে এরা বিপদে পড়েছে। কাজেই এমন একটা সৃষ্টি ছাড়া মজুরি তারা চেয়ে বসলো যে, অমরনাথের মতন মানুষও একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন হয়ত-বা জীবনযাত্রার মান এখানে উন্নত হয়ত' এইটেই এখানকার যথার্থ মূল্য। রেগেমেগে বললেন, আচ্ছা চল্, তাই দেবো।

কুলিরা মাল তুললে মাথায়। অমরনাথ আর শীলা চললো তাদের পিছু পিছু।

জেটি পার হয়ে সবে তখন তারা শ'মিলের পাশ দিয়ে হাঁটছে, সুমুখে চ্যাথাম্-বে'র পুলের ওপর দিয়ে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো তাঁদের পাশে। ড্রাইভার বললে, এই যে গাড়ী এনেছি বাবু, উঠুন।

বলেই সে গাড়ী থেকে নেমে কুলিদের মাথা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিজেই গাড়ীতে তুলে নিলে।

এইটুকু বয়ে আনবার জন্যে তিনজন কুলিকে মনের আনন্দে তিনটি টাকা বখশিস্ দিয়ে অমরনাথ গাড়ীর ওপর উঠে বসলেন। শীলাকে বললেন, শেষ পর্য্যন্ত গাড়ী তাহ'লে পাঠিয়েছেন!

শীলা বললে, মানুষটি ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

ড্রাইভার গাড়ীতে উঠে বসতেই শীলা বললে, সোজা

—জানি।

বলেই ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দিলে।

আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ী চললো।

শীলা দেখতে দেখতে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হলো যেন সেই লোকটি রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছে। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ, হাতে স্যুটকেস। তার সাহায্য ছাড়াই গাড়ী তারা পেয়ে গেছে—শীলার একবার মনে হলো কথাটা তাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে জানিয়ে দেয়। কিন্তু গাড়ীটা এত জোরে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো যে, কোনো-কিছুই তার বলা হলো না। মুখের কথা মুখেই আটকে রইলো।

অমরনাথ অন্য দিকে তাকিয়েছিলেন।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছো?

—জায়গাটা যত খারাপ ভেবেছিলাম তত খারাপ নয়।

শীলা বললে, কিন্তু শীত কোথায়? বাংলাদেশে এটা তো পৌষ মাস।

কথাটা বোধ হয় গাড়ীর ড্রাইভার শুনতে পেয়েছিল। সেই জবাব দিলে। বললে, শীত এখানে নেই। এখানে শুধু বর্ষা আর গরম।

দেখতে দেখতে গাড়ী এসে দাঁড়ালো বড় হাসপাতালের কাছে। একটা গাছের ছায়ায় গাড়ীটাকে রেখে শীলা নামলো গাড়ী থেকে। বললে, আমি আগে দেখা করে আসি।

মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার ভাদুড়ী তখন সবেমাত্র একটা কেস দেখে এসে তাঁর অফিসের চেয়ারে বসে চুরুটটা ধরাতে যাচ্ছিলেন। শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে চুরুটটা তাঁর আর ধরানো হলো না। হাতের দেশলাইটা নিবে গেল।

শীলা বললে, আমি মিস্ শীলা চক্রবর্ত্তী।

ডাক্তার ভাদুড়ী বললেন, আপনি এসে গেছেন? হ্যাঁ ঠিক। আজই তো আপনার আসবার কথা। আমি একদম ভুলে বসে আছি। আই এম ভেরি সরি। বসুন। আমি চুরুটটা ধরিয়ে নিই।

এই বলে তিনি দেশলাইটি জ্বাললেন।

বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষটি! এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

শীলা বললে, বাইরে আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমার থাকবার জায়গাটা—আপনাকে আমি সব কথাই চিঠিতে লিখে জানিয়েছি। টেলিগ্রাম করেছি। পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

—হাঁ হাঁ পেয়েছি, নিশ্চয়ই পেয়েছি। আমি ভেবেছিলাম পাগল আপনি। নার্সের চাকরি করবেন, একা একখানা আলাদা বাড়ীর কি দরকার? চিঠিখানা আমার স্ত্রীর হাতে দিলাম। স্ত্রী বললে, তুমি পাগল। বাড়ী চেয়েছে, ছোট বাড়ী একখানা ঠিক করে রাখো না! নেয় নেবে, না নেয় না নেবে। আমি বললাম আমি পারব না, আমার সময় নেই, তুমি ঠিক করে রাখো। চিঠিটা আমার স্ত্রীর হাতেই দিয়ে দিয়েছিলাম। স্ত্রীই আমার সেক্রেটারী কিনা!—বলবেন না যেন।

কথা বলতে গিয়ে চুরুটটা আবার নিবে গিয়েছিল।

আবার দেশলাই জ্বালিয়ে চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমি শুধু ডাক্তারি করি। আমার ডাক্তারি করে আমার স্ত্রী।—হ্যাঁ মনে পড়েছে। আজ বাজার করবার সময় আমার স্ত্রী বলেছিল চাকরটাকে বেশি করে হরিণের মাংস আনতে। আপনারা আজ আসবেন সে জানে। গণেশ! গণেশ!

ডাক শুনে একটি পনেরো ষোলো বছরের ছেলে এসে দাঁড়ালো।

ডাক্তারবাবু বললেন, একে নিয়ে যা আমার কুঠিমে। সমঝা? আপনি একা তো?

শীলা বললে, না আমি একা নই। আর-একজন আছে।

—আর একটি মেয়ে?

—না আমার ভগ্নিপতি।

—আহা হা তাঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেন? চলুন, দেখি।

উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তারবাবু।

শীলা বললে, আপনি আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন? তুমি বলবেন।

ডাক্তারবাবু হাসলেন। হেসে একবার তাকালেন শীলার মুখের দিকে। বললেন, কাজে লাগো, তখন তুমি বলবো।

শীলার সঙ্গে তিনিও গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

শীলা বললে, ইনিই আমার ভগ্নিপতি ডক্টর অমরনাথ মুখার্জি।

ডাক্তারবাবু বললেন, আপনিও ডাক্তার?

অমরনাথ হেসে বললেন, আজ্ঞে না। আমি ডক্টর অভ্ মেডিসিন নই, ডক্টর অভ্ ফিলজফি।

ডাক্তারবাবু বললেন, ওরে বাবা, বিদ্বান মানুষ। আমরা সব মুখ্খু-সুখ্খু মানুষ মশাই। নমস্কার। বাড়ীতে কথা হবে। যান।

এই বলে গণেশকে আর শীলাকে গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, গণেশ, তোর মা-জির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবি।

গণেশ বললে, মা-জি তো এখন বাড়ীতে নেই। ইস্কুলে।

ডাক্তারবাবু বললেন, সত্যিই তো! সেকথা আমার মনেই ছিল না। আমার স্ত্রীও এক বিদুষী মহিলা মশাই, আপনার সঙ্গে মিলবে ভাল। তবে ডি-লিট্ ফিট্ নয়, বি-এ গ্র্যাজুয়েট। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে মন্টিসেরী মেথডে পড়াবার জন্যে একটি ইস্কুল করেছেন এক ভদ্রমহিলা; আমার স্ত্রীও সেখানকার শিক্ষয়িত্রী।—তা হোক, গণেশ, ওঁদের গাড়ীতে বসিয়ে রাখা উচিত নয়, বাড়ীতে রেখে আয়।

ড্রাইভারের দিকে এতক্ষণ তার নজর পড়েনি, এইবার তার দিকে তাকাতেই তাকে চিনতে পারলেন।

—কানাই নাকি? যা বাবা, এঁদের রেখে আয় আমার বাড়ীতে। আমার এখন অনেক কাজ, নইলে আমিও যেতাম। নমস্কার! নমস্কার! নমস্কার!

দাঁত দিয়ে চুরুটটাকে চেপে ধরে বারংবার নমস্কার বলতে বলতে তিনিও ফিরলেন। গাড়ীও ফিরলো।

ডাক্তারবাবুর বাড়ীটা বেশি দূরে নয়। পাহাড়ের একটা টিলার ধারে স্নন্দর একটি কাঠের দোতলা বাংলো। বাড়ীর দোর পর্য্যন্ত গাড়ী চলে গেল।

গাড়ীর হর্ণ শুনেই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলো একজন চাকর আর সিঁড়ির মাথার ওপরে দোরের রঙিন পর্দ্দা সরিয়ে হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে। ফর্সা গায়ের রং, লম্বা ছিপছিপে গড়ন। সেইখান থেকেই বললে, আপনারা ওপরে চলে আস্থন। গণেশ, তুই বাবা ভৈরোকে সঙ্গে নিয়ে ওঁদের জিনিষপত্র নীচের ঘরে ঢুকিয়ে দে।

গাড়ী থেকে নামলো শীলা।

অমরনাথ পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে গাড়ীর ভাড়া দিতে যাচ্ছিলেন, কানাই ড্রাইভার বললে, ভাড়া তো পেয়ে গেছি বাবু।

অমরনাথ অবাক্ হয়ে বললেন, ভাড়া তোমাকে কে দিলে?

কানাই বললে, সেই যে সাহেবী পোষাক-পরা কাঁধে ব্যাগ-ঝোলালো বাবু—যিনি আমাকে পাঠালেন আপনাদের কাছে।

—বুঝেছি। বলেই অমরনাথ তাকালেন শীলার দিকে।

শীলা তখন কি যে বলবে কি যে করবে বুঝতে পারছে না।

চন্দন সম্বন্ধে কী খারাপ ধারণাই না সে করেছিল! ভাগ্যিস গাড়ী থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলে ফেলেনি!

কিন্তু তাই-বা কেমন করে সম্ভব?

শীলা বললে, আমরা যে হাসপাতালে আসবো সেকথা সে জানলে কেমন করে ?

অমরনাথ বললেন, আমি বলেছিলাম।

কিন্তু সেকথা বিশ্বাস করলে না শীলা। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তাকে চিনলে কেমন করে? তোমার সঙ্গে ওর দেখা হলো কখন ?

অমরনাথ বললেন, জাহাজে। তুমি যখন পাগলের মত তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে।

—সে বুঝি এসেছিল তোমার কাছে ?

অমরনাথ মুখ টিপে একটু হাসলেন। বললেন, আমার কাছে কি তোমার কাছে জানি না। তবে হ্যাঁ, এসেছিল।

শীলা বললে, কই, আমাকে তো সেকথা জানাওনি ?

—না জানাইনি।

—কেন ?

অমরনাথ হেসে জবাব দিলেন। বললেন, তোমাকে হারাবার ভয়ে।

—তোমারই নাম শীলা চক্রবর্ত্তি ?

মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখে, মেয়েটি দোতলা থেকে নেমে এসেছে নীচে।

শীলা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই শীলা চক্রবর্ত্তি। আপনি বুঝি—

—আমি যেই হই না কেন, তোমার কি ?

এই বলে দুহাত দিয়ে শীলাকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে এনে বললে, আমি এ-বাড়ীর গিন্নি।

শীলা বললে, তবে যে শুনলাম আপনি ইস্কুলে গেছেন ?

—সে কথাটিও বলেছে বুঝি ? ডাক্তারকে নিয়ে আর পারলাম না দেখছি ! তোমাদের জন্যে রান্নাবান্না করে ইস্কুলে ছুটি নিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছি, তা জানো ? অত দূর থেকে জাহাজে আসবে, তারপর এখানে এসে যদি আরাম করে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসতে না পাও, কি মনে হবে বল তো ? ইনিই বুঝি তোমার ভগ্নিপতি ?—যাঁর কথা চিঠিতে লিখেছিলে ?

শীলা ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

—নমস্কার ! অমরনাথ হাত জোড় করে নমস্কার করলেন।

ডাক্তার-গিন্নি বললে, ওরা জিনিসপত্র ঠিক রাখবে, আপনারা আসুন।

বলে ওপরে নিয়ে গিয়ে তাদের খাবার টেবিলে বসিয়ে দিলে।

শীলা বললে, কি বলে ডাকবো আপনাকে দিদি ?

ডাক্তার-গিন্নি বললে, 'তুমি' বলে ডাকবে।

এই বলে সেও টেবিলের মুখোমুখি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো। বললে, আমি তোমার দিদি, আর তোমার জামাইবাবু অমরনাথবাবু আমার দাদা।

—জামাইবাবুর নাম তুমি জানলে কেমন করে দিদি ?

—বল্ দেখি—কেমন করে জানলাম ?

শীলা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

—ভেবে ছ্যাখ্ বসে বসে, আমি খাবার দিতে বলি। ঠাকুর ! ঠাকুর !

ঠাকুর খাবার নিয়ে এলো।

অমরনাথ বললেন, বুঝেছি। আমার সুটকেসের ওপর লেখাটা তুমি পড়েছ। দাদা না-হয় হলাম, কিন্তু বোনের নামটি আমার জানা দরকার।

—বোনের নাম মিনতি। কিন্তু ডাক্তারবাবু নামটাকে এমন

করে দুম্‌ড়ে মুচড়ে নিজের মত করে নিয়েছে, শুনলে হাসি পায়।

শীলা ধরে বসলো, ডাক্তারবাবু কি বলে ডাকেন, বল-না দিদি?

—না। তার মুখ থেকেই শুনবি।

নানা রকমের রান্না দেখে শীলা বলে উঠলো, এ তুমি করেছ কি দিদি?

মিনতি বললে, তোকে আর সমালোচনা করতে হবে না। চুপটি করে খেয়ে নে। জাহাজে কি খেয়েছিস তা তো জানি। এখানে মাছ আর মাংস ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। থাক্ এখানে। থাকলেই বুঝতে পারবি।

কিন্তু সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটা শীলার এখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলে, আমার বাড়ীর কি করেছ দিদি?

মিনতি বললে, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস?

—কি মনে হচ্ছে?

—তুই নার্সের চাকরি করতে আসিসনি। তোর অন্য কোনও মতলব আছে।

—এ সন্দেহ তোমার কেন হ'লো বল তো? শুনছো জামাইবাবু?

অমরনাথ বললেন, সব শুনছি। বল।

মিনতি বললে, নার্সের চাকরি করতে যারা আসে তারা আলাদা একখানা বাড়ী নিয়েও থাকে না, সঙ্গে একজন গার্জেনও আনে না। বাড়ীর ভাড়া দিয়ে ঠাকুর চাকর রেখে তুমি এখানে থাকবে কেমন করে শুনি? ঠাকুর চাকরের কত মাইনে জানো?

শীলা বললে, 'তুই' বলতে বলতে হঠাৎ 'তুমি' বলছো যে?

—বেশ করছি। বাড়ী কি সত্যিই নিবি?

—হ্যাঁ, নেবো।

—খরচ চালাতে পারছি না বলে পালাবি না তো?

শীলা তাকালে অমরনাথের দিকে। বললে, উনি যতদিন আছেন ততদিন পালাব না।

মিনতির মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেল। চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল সে।

ভাববার কথাই।

যুবতী এই সুন্দরী মেয়েটা থাকবে তার এই যুবক ভগ্নিপতির কাছে, আলাদা একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে। প্রতি মাসে যা খরচ হবে তা' একটা নার্সের মাইনেয় কুলোবে না।

এরা নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছে দেশ থেকে।

মিনতি আর ঘাঁটালে না। বললে, বাড়ী একখানা ঠিক করে রেখেছি। ছোট বাড়ী। ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম কর, তারপর দিয়ে আসবো তোদের।

এই বলে মিনতি সেখান থেকে উঠে চলে গেল।

খেয়েদেয়ে শীলা সুমুখের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। এদিকে ওদিকে ছোট ছোট কাঠের দোতলা বাড়ী, নানারকমের গাছ, আর দূরে দেখা যাচ্ছে সাগরের জল। নারকেলের গাছই বেশি। রৌদ্র এসে পড়েছে গাছের মাথায়। দূরে সাগরের জল চিক্ চিক্ করছে।

ভারি ভাল লাগছে শীলার। যেদিকে তাকাচ্ছে, সেদিক থেকে চোখ যেন ফেরাতে পারছে না।

—প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম হলো নাকি তোমার ?

ছোট্ট একটুখানি জায়গা কাঠের পার্টিসান দিয়ে ঘিরে বসবার জায়গা করা হয়েছে! সেইখানেই বসে ছিলেন অমরনাথ।

শীলা হাসিমুখে পেছন ফিরে তাকালে। বললে, এসো এইখানে। দেখে যাও কিরকম লাগছে।

অমরনাথ কিন্তু গেলেন না শীলার কাছে। যেমন বসে ছিলেন

তেমনই বসে রইলেন।

গণেশ এসে খবর দিলে, গাড়ী এসেছে। আপনারা আসুন।

অমরনাথ ডাকলেন, শীলা !

শীলা আবার তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। কথাটা শুনতেই পেলে না।

অমরনাথ আঙুল বাড়িয়ে শীলাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, দিদিমণিকে ডাকো।

গণেশই এগিয়ে গেল শীলার কাছে। ডাকলে, দিদিমণি !

—কে ?

গণেশকে দেখেই শীলা বললে, তুমি এখনও হাঁসপাতালে ফিরে যাওনি ?

গণেশ বললে, না দিদিমণি। আমি একখানা গাড়ী ডাকতে গিয়েছিলাম। গাড়ী এসেছে। আপনারা আসুন।

শীলা বোধ করি অন্য কথা ভাবছিল। ফস্ করে বলে ফেললে, কোথায় যাব ?

অমরনাথ তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, ভেবেছ কি এইখানেই থাকবে ?

এতক্ষণে শীলার যেন চমক ভাঙলো। জিজ্ঞাসা করলে, দিদি কোথায় ?

গণেশ বললে, নীচে গাড়ীর কাছে। আপনাদের জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলছেন।

নীচে গিয়ে দেখলে সত্যিই তাই।

ট্যাক্সির কাছে মিনতি দাঁড়িয়ে। ঠাকুর, চাকর, ড্রাইভার—সবাই মিলে জিনিসপত্র তুলে ফেলেছে গাড়ীতে।

শীলা বললে, তুমিও যাবে তো দিদি, আমাদের সঙ্গে ?

মিনতি বললে, হ্যাঁ যাব।

মিনতির কথা বলার ভঙ্গীটা কেমন যেন অন্যরকম মনে হলো।

মনে হলো হঠাৎ সে যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

যে-মিনতি এতক্ষণ হেসে কথা বলছিল, এ-মিনতি যেন সে প্রাণচঞ্চলা মিনতি নয়। এমন কী ঘটনা এরই মধ্যে ঘটলো, যার জন্য তার এই ভাবান্তর—শীলা বুঝতে পারলে না।

মিনতি বললে, দাদা আপনি উঠুন গাড়ীতে।

অমরনাথ ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলেন।

—ওখানে কেন? আপনি ভেতরে আসুন।

অমরনাথ বললেন, না, তোমরা পিছনে থাকো।

মিনতি বললে, আমাদের তিনজনকেই পেছনে বসতে হবে দাদা। ওখানে অন্য লোক আছে।

অমরনাথকে বাধ্য হয়ে নীচে নেমে এসে পেছনের সিটে গিয়ে বসতে হলো।

অমরনাথকে আর শীলাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে মিনতি গণেশকে বললে, তুই সামনে বোস্! জিনিসপত্রগুলো গাড়ী থেকে নামিয়ে ঘরে তুলতে হবে তো!

সবার শেষে মিনতি গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললে, চল। ছোট করাত-কলটার পাশে।

ঠাকুর দাঁড়িয়ে ছিল দোরের কাছে। মিনতি বললে, ডাক্তারবাবু এলে তাকে খেতে দিও।

ঠাকুর বললে, আপনি খেয়ে গেলেই পারতেন।

মিনতি বললে, এসে খাব!

শীলা চেঁচিয়ে উঠলো, ও মা! তুমি এখনও খাওনি দিদি? আর আমাদের বসে বসে খাওয়ালে?

গাড়ী তখন ছেড়ে দিয়েছে।

মিনতি বললে, ডাক্তারবাবু না খেলে আমি খাই না!

শীলা বললে, তবে যে শুনলাম তুমি ইস্কুলে যাও?

মিনতি বললে, ইস্কুলে আমার খাবার নিয়ে যায়।

উঁচু একটা টিলার ওপর চারিদিকে বেড়া-দেওয়া সুন্দর একটি কাঠের বাংলো বাড়ী। কাঠের ফটক খোলাই ছিল। মেহেদী-বেড়ার পাশ দিয়ে গাড়ীটা ঢুকে গেল ভেতরে।

মোটর-বাইক্ নিয়ে একটি ছোকরা দাঁড়িয়েছিল।—দাঁড়িয়েছিল বোধকরি তাদেরই অপেক্ষায়। ছোক্‌রাটি যেমন লম্বা, তেমনি কালো। গাড়ীটা গিয়ে দাঁড়াতেই হাসতে হাসতে সে এগিয়ে এলো গাড়ীর কাছে। বললে, নমোস্কার এভ্‌রিবডি।

কথা বলবার ধরণ দেখে মনে হলো অবাঙ্গালী।

মিনতি নামলো গাড়ী থেকে। লোকটির দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হেসে ঠিক তারই বলবার ভঙ্গীটি অনুকরণ করে বললে, নমোস্‌কার! তুমি যে এ-সময় থাকবে তা তো ভাবিনি ভাস্কর।

ভাস্কর বললে, এক্ষুনি আমি আসছি নিকোবর থেকে। আবার চলে যাচ্ছিলাম, ইমন সময় দেখি, গাড়িটি ঢুকছে।

গণেশের হাতে ঘরের চাবিটা দিয়ে ঘর খুলে জিনিসপত্র তুলে রাখতে বললে মিনতি।

গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালেন অমরনাথ। শীলা নেমেছে গাড়ী থেকে। ভাস্করের সঙ্গে মিনতি তাদের পরিচয় করে দিলে। বললে, এই ছেলেটিই এ-বাড়ীর মালিক।

তারপর অমরনাথ আর শীলাকে দেখিয়ে বললে, এরাই থাকবে এ-বাড়ীতে।

হাত জোড় করে ভাস্কর তাদের নমস্কার জানিয়ে মিনতিকে আক্রমণ করে বসলো :—আপনি আমাকে 'ছেলেটি' বললেন কেন? আই এ্যাম্ নট্ এ বয়।

মিনতি বললে, বয় নও তো কী তুমি?

ভাস্কর বললে, আই এ্যাম্ টুয়েন্‌টি এইট্।

ইউ আর ওন্‌লি এইট্টিন্। ইউ ডু নট্ লুক লাইক্ টুয়েন্‌টি

এইটু।

ভাস্বর আনন্দে একেবারে গদ-গদ হয়ে উঠলো। হাসতে হাসতে বললে, ও নো-নো-নো-নো।

মিনতি বললে, যারা বিয়ে করে না তারা 'বয়' নয় তো কী? তুমি একটি না-বালক।

এই বলে শীলার দিকে তাকিয়ে মিনতি বললে, ভাস্বর বড় ভাল ছেলে।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, 'ভাস্বর' কিরকম নাম দিদি? উনি কোন্ দেশী মানুষ?

শীলার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ভাস্বর ছটফট্ করছিল। বললে, আই এ্যাম্ ফ্রম মাড্রাস ম্যাডাম্।

মিনতি বললে, হ্যাঁ ও মাদ্রাজী! চল্ তোকে ঘরগুলো দেখিয়ে দিই। ওর 'ভাস্বর' নামের একটা ইতিহাস আছে। বলছি। আয়।

দু'খানা বেশ সুন্দর ঘর, রান্নাঘর খাবার ঘর স্নানের ঘর। অভাব কিছুই নেই।

নিজের জন্যে মাত্র একখানা ঘর রেখে বাকি সবটাই ভাড়া দিয়ে দিয়েছে ভাস্বর।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, ওর নিজের রান্না হবে কোথায়?

মিনতি বললে, ও এখানে থাকে নাকি যে রান্না হবে? মাগ-না-ছেলে ঢেঁকি-না-কুলো, ও একটা ভ্যাগাবণ্ড।

ভাস্বর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছিল। শীলার দিকে বার-বার তাকাচ্ছিল আর হাসছিল। 'ভ্যাগাবণ্ড' কথাটা শুনলে, কিন্তু প্রতিবাদ করলে না।

মিনতি আবার বললে, খাওয়া তো ওদের ছাই-ভস্ম ইটলি-দোসা-সম্বর। খাওয়াটাকে ওরা খুব সহজ করে নিয়েছে। হোটেলে বসে কলাপাতা পাতলে, আর খেয়ে নিলে। হঠাৎ এক এক দিন

এসে যদি চান-টান করে তো ওই এক বাথ-রুমেই করবে।

শীলা বললে, তা না-হয় করলে, কিন্তু দিদি, ওঁর নামের ইতিহাসটা বল। 'ভাস্থর' নামটা ভাবছি আর হাসি পাচ্ছে।

'ইতিহাস-টিতিহাস' কিছু নয়।—মিনতি বললে, ও প্রথম যখন এই আন্দামানে এলো, নাম বললে—ভি-এ স্থন্দরম্। স্থন্দর যে কিরকম—তা তো দেখতেই পাচ্ছিস্।

ভাস্থরের মুখের ওপরেই বললে কথাটা। কিন্তু আশ্চর্য, ওর মুখের এতটুকু বিকৃতি হলো না। শুনে হাসতে লাগলো শুধু।

মিনতি বললে, ভি-এ স্থন্দরম্ বলে তো ডাকা যায় না মানুষকে। ভি-এ কথাটাকে 'ভা' করে নিয়ে দিনকতক ডাকলাম ভা-স্থন্দরম্ বলে। তারপর তাকেও ছোট করে নিয়ে করলাম—ভাস্থর।

ভাস্থর রাগ করে না। বিশেষতঃ মেয়েদের কথায়। মিনতি বললে, ভাস্থর, তুমি এবার একটি বিয়ে কর। নইলে

একটু হেসে শীলাকে দেখিয়ে বললে, এই সব স্থন্দরী মেয়েরা তোমার সঙ্গে কথা বলবে না।

ভাস্থর বললে, নাঃ, বিয়ে আমি করব না।

কেন? ভীষ্মদেব হবে নাকি?

হাসতে হাসতে ভাস্থর বললে, সে-সব অনেক কথা। বলব একদিন আপনাকে।

ঘর-দোর দেখা শেষ হয়ে গেল।

ভাস্থর বললে, কিন্তু এঁদের ফার্ণিচার তো কিছু নেই। চেয়ার টেবিল, খাট—

মিনতি বললে, কিনবে।

ভাস্থর বললে, হোয়াই? আমার একগাদা জিনিস পড়ে রয়েছে না এবার্ডিন-বাজারে? ফার্ণিচারের দোকান করেছিলাম জানেন তো?

মিনতি বললে, কি জানি বাবা, তোমার সম্বন্ধে জানা একটুকু

মুস্কিল। তবে এইটুকু শুধু জানলাম যে, শীলাকে আর ফার্ণিচারের ভাবনা ভাবতে হবে না।—কাজ তো হয়ে গেল, এবার আমি চলি।

এই বলে বাইরে এসে দেখে, তাকে একা ফেলে রেখে সবাই চলে গেছে। গাড়ীও নেই, চাকরও নেই।

মিনতি বললে, কপালে হাঁটা আছে, কে ঘোচাবে বল।

ভাস্থর বলে উঠলো, আমি আমার বাইকে চড়িয়ে—দিয়ে আসতে পারি আপনাকে।

মিনতি ঘাড় নেড়ে বললে, না, তোমার পিঠে চড়ে যেতে ভরসা হয় না বাপু। পিঠটা তোমার খুব লোভনীয়ও নয়, শক্তও নয়। পোর্ট-ব্লেয়ারের রাস্তায় গড়িয়ে যদি পড়ি, হাড়-গোড় ভেঙ্গে যাবে।

ভাস্থর বললে, ভাঙ্গে তো তখন ডাক্তারবাবু আছেন, ভাবনা কি?

ওরে বাবা, তুমিও রসিকতা শিখেছ? চলি।

এই বলে ভাস্থরকে আর-কিছু বলবার অবসর না দিয়েই মিনতি গেটের দিকে এগিয়ে গেল। শীলাও তার পিছু পিছু যাচ্ছিল। মিনতি বললে, তুই আবার কিজন্যে আসছিস? ঘর-সংসার গোছগাছ করে নে, যা।

শীলা হেসে বললে, আমার আবার ঘর-সংসার!

ভগ্নিপতিকে নিয়ে সংসার তো পাতালি। সংসার নয় কেন?

কথাটা যে কিসের ইঙ্গিত—সেকথা বুঝবার মত বুদ্ধি শীলার যথেষ্টই আছে। শীলা বুঝতে সবই পারলে, কিন্তু জবাব দিতে পারলে না। জবাব দিতে হলে অনেক কথাই বলতে হয়। সে যে বিপত্নীক ভগ্নিপতিকে নিয়ে সংসার পাতাবার জন্যে এখানে আসেনি—সে এসেছে তার ভাইএর সন্ধান করতে; কথাটা হয়ত-বা সে বিশ্বাস নাও করতে পারে।

শীলা কোনও কথা বলছে না দেখে গেটটা পেরিয়ে মিনতিই

কথা বললে। বললে, তোর আবার আর-একটা ফেউ জুটলো।

শীলা কি যেন ভাবছিল, কথাটা ভাল করে শুনতেও পায়নি। বললে, উঁ ?

মিনতি থমকে থামলো। বললে, শোন্ !

'শোন' বলেই চুপ করে গেল।

কি যেন বলতে গিয়েও বললে না।

—'না, থাক। পরে বলবো।

শীলা কিন্তু ছাড়লে না। 'না, তোমাকে এক্ষুনি বলতে হবে।'

মিনতি বললে, ওই যে সুন্দরম্, ওরই কথা বলছিলাম।

বল-না কি বলবে।

ওকে চিনতে পেরেছিস তুই ?

শীলা একটু হেসে বললে, হ্যাঁ। মানুষটা দেখতে খারাপ, কিন্তু মনটা ভাল।

মিনতি বললে, লোভ আছে, সাহস নেই। তবু একটু সাবধানে থাকবি। বেশি হেসে হেসে কথা বলবি না।

শীলা হঠাৎ একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বসলো। হাত দুটো বাড়িয়ে মিনতিকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললে। ঠোঁট দুটো তার থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলে না।

মিনতি অবাক হয়ে গেল। এ কি কাণ্ড ? কাঁদছিস কেন তুই ? কি বলতে চাস্ বল্ না !

শীলা একটু সামলে নিলে নিজেকে। বললে, এরই মধ্যে তুমি আমাকে এত ভাল কেন বাসলে দিদি ?

—ভাল আবার কোথায় বাসলাম রে ? ভালবাসা এত সস্তা নয়। ছিঃ, চোখের জল ফেলতে নেই।

এই বলে মিনতি আঁচল দিয়ে তার চোখ দুটো মুছে দিলে। বললে, একে তোর এই কাঁচা বয়েস, তার ওপর এই আগুনের মতন

রূপ। তোর ভয়ই তো সব-চেয়ে বেশি। ঠিক মানুষটিকে যদি চিনতে না পারিস তো সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মরতে হবে।

শীলা বললে, জানি।

জানবিই তো! কে না জানে এ-কথা? সব মেয়েই জানে।

এই বলে শীলাকে একটু আদর করে মিনতি বললে, সব কিছু জেনেশুনে তোরই মত পরমাসুন্দরী একটি মেয়েকে আমি আমার চোখের সামনে ভেসে যেতে দেখেছি। অনেক চেষ্টা করেছিলাম, ফেরাতে পারিনি! যাবার সময় বলে গিয়েছিল, ভালবাসার মর্ম্ম তুমি কেমন করে বুঝবে দিদি, তুমি আর কথা বোলো না। চুপ কর। চুপ করেই ছিলাম। তুই আসবার আগেই তার একখানা চিঠি পেয়েছি। তোকে দেখাব সে-চিঠি। আজ চলি। ডাক্তার হয়ত এসে গেছে।

হ্যাঁ যাও, তোমার এখনও খাওয়া হয়নি।

শীলা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। পোর্ট-ব্লেয়ারের সেই পাহাড়-ভাঙা উঁচু নীচু রাস্তার ওপর দু'পা এগিয়ে গিয়েই আবার সে থেমেছিল. একবার: পেছন ফিরে দেখেছিল শীলা গেল কিনা, তারপর তার সেই সুন্দর মুখে বড় সুন্দর একটি হাসি হেসে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে মিনতি চলে গিয়েছিল সেদিন।

সত্যিই ভারি মজার মানুষ এই ভি-এ সুন্দরম।

শীলাকে মিনতি বারণ করে দিয়েছে—সে যেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে কথা না বলে।

বলেওনি সে।

কোমরে বেশ করে কাপড়টাকে জড়িয়ে নিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জিনিসপত্র খুলে খুলে গুছিয়ে রাখছিল, এমন সময় সুন্দরম এসে দাঁড়ালো। বললে, এবার আমাকে ছুটি দিন। আমি চট করে একবারটি ঘুরে আসি।

কথাটা অমরনাথ বোধকরি শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন, চলুন আপনার সঙ্গে আমিও একবার যাই।

কেন ?

অমরনাথ বললেন, এখানে থাকতে হলে খেতে নিশ্চয়ই হবে। আর খেতে হলে উনোন জ্বালাতে হবে। তার জন্যে চাই কাঠ, কয়লা তারপর চাই চাল, ডাল, নুন, তেল, কিছু আনাজ, মাছ মাংস—

কথাটা তাঁকে শেষ করতে দিলে না সুন্দরম। বললে, একটি কাগজে সব-কিছু লিখে দিন।

বাঙ্গালীর খাবার, আপনি সব দেখেশুনে আনতে পারবেন ?

সুন্দরম বললে, আমি কেন আনবো ? আমার লোকজন অনেক আছে।

লোকজনের কথা শুনে একজন রাঁধুনীর কথা মনে পড়ে গেল অমরনাথের। বললেন, শীলা কাল কাজে যাবে। এখানকার হাঁসপাতালের কাজ। কখন ডিউটি পড়বে কিছুই জানা নেই। রান্না করবার সময়ই হয়ত পাবে না। তার জন্যে চাই একজন লোক।

সুন্দরম হাসতে হাসতে বললে, নাঃ, আপনারাও মিসেস ভাদুড়ীর মত আমাকে ভেবেছেন 'মিয়ার এ বয়।' আপনারা দুই স্বামী স্ত্রী চুপ করে বসে বসে দেখুন আমি কি করি।

শীলা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল সবই। ভাসুর তাদের স্বামী স্ত্রী ভেবেছে। ভাববেই তো। একটুখানি হেসে সে অমরনাথের দিকে তাকালে। তাকানোই যথেষ্ট। কিছু বলবার দরকার হলো না।

অমরনাথ বললেন, আমরা আপনাকে 'বয়' ভাববো না, আপনি দয়া করে আমাদের স্বামী স্ত্রী ভাববেন না।

সুন্দরম বলে উঠলো, দেন্ ? হোয়াট ?

অমরনাথ তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তারা স্বামী স্ত্রী নয়। শীলা

তাঁর শালী অর্থাৎ ওয়াইফ্‌স্‌ সিস্‌টার। এণ্ড শী ইজ্‌ আন্‌ম্যারেড।

বাস্‌, আর কিছু শোনবার দরকার হলো না স্থন্দরমের। হাতের দুটো আঙ্‌ল দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললে, দেন্‌ টু বেড্‌স্‌, নট্‌ ওয়ান।

বলেই সে তার মোটর-বাইকে চড়ে বসলো।

ভট্‌ ভট্‌ আওয়াজ করতে করতে বাইকটা গেট পেরিয়ে চলে যাবার পর, অমরনাথ বললেন, এবার একটা কাগজে বড় বড় করে লিখে রাখতে হবে—উই আর নট্‌ হাজ্‌ব্যাণ্ড এণ্ড ওয়াইফ। শীলা আমার শালী। লিখে এইখানে টাঙিয়ে দেবো।

শীলা বললে, পরিচয় দিতে কি খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

—তা একটু হচ্ছে বই-কি!

—তাহ'লে একটা শুভদিন দেখে কাজটা সেরে ফ্যালো। মিনতিদির সন্দেহটা পাকাপাকি হয়ে যাক্‌।

—তারপর? যদি বনিবনাও না হয়? যদি ভুল হয়ে যায়?

—তখন ডাইভোর্স। আইন তো পাশ হয়েই গেছে।

—ডাইভোর্স মানে তো ছাড়াছাড়ি। অমরনাথ বলতে লাগলেন। মনে হলো যেন আপনমনেই বলে চলেছেন: চির-জীবনের জন্যে ছাড়াছাড়ি! তখন আর এক-বাড়ীতে থাকা চলবে না। পরস্পরের প্রতি একটা ঘৃণা—

এই পর্য্যন্ত বলেই হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। হাসিরহস্য করতে গিয়ে কেমন যেন একটা বেদনার স্পর্শ অনুভব করলেন। তাই তিনি কথাটার মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্যই বোধকরি অন্য কথা পেড়ে বসলেন। বললেন, স্থন্দরম তো আমাকে যেতে দিলে না। কী যে করবে কিছু বুঝতে পারছি না।

শীলা স্থমুখের ঘরে তখনও ঘুরে ঘুরে কি যেন সব কাজ করে বেড়াচ্ছিল। বললে, একটা······কিছু করবে নিশ্চয়ই। তবে তুমি

যদি চাও তো ষ্টোভ জ্বালিয়ে আমি তোমাকে খুব ভাল করে এক পেয়ালা চা খাইয়ে দিতে পারি।

অমরনাথ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, এক পেয়ালা কেন? এখন আর এক বলে কোনও কথা নেই, সব দুই। দু'জনের দু' পেয়ালা কর।

শীলা বললে, দুই নয়, তিন। ভাস্কুরকে বাদ দিতে পারি না। মানুষটির চাল এবং চুলো দুইই আছে, অথচ সব থেকেও যেন কিছুই নেই।

অমরনাথ হাসলেন। বললেন, আহা, এই জন্যেই কবিরা তোমাদের দয়াময়ী নাম দিয়েছেন।

গরম চায়ের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে শীলা যখন সবেমাত্র গিয়ে দাঁড়িয়েছে অমরনাথের কাছে, এমন সময় মোটর-বাইকের আওয়াজ শোনা গেল।

শীলা বললে, দেখলে? ঠিক সময়ে এসে গেছে।

বলেই সে ভাস্কুরের জন্য চায়ের পেয়ালাটি আনতে গেল।

ভাস্কুর একা আসেনি। গাড়ীর পেছনে বসিয়ে বিশ-পঁচিশ বছরের একজন বাঙ্গালী ছোকরাকে সঙ্গে এনেছে। ছেলেটির নাম পরেশ।

ভাস্কুর বললে, এই নিন আপনাদের কম্‌বাইণ্ড হ্যাণ্ড। রান্নার কাজও করবে, চাকরের কাজও করবে। মাইনে আমি ঠিক করে দেবো।

শীলা চায়ের পেয়ালাটি তার হাতের কাছে নামিয়ে দিতেই আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠলো ভাস্কুর।—গুড্ গুড্ গুড্! পরেশ, তুমি দেখে নাও তোমার মা-জিকে।

শীলা বললে, মা-জি নই, আমি দিদিমণি।

ভাস্কর হেসে বললে, শুনলে তো? দিদিমণি বলবে। আজ সব ঠিক করে নাও। দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করে বাজার থেকে সবকিছু এনে রাখো। আজ রাত্রের খাবার এনে দেবে আমাদের রেষ্টুরেন্ট থেকে।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, রেষ্টুরেন্ট থেকে কেন?

সুন্দরম বললে, আমার একটা রেষ্টুরেন্ট আছে। আজ রাত্রের খাবারটা সেইখান থেকেই আসুক। কাল সকাল থেকে রান্না হবে এইখানে। আপনারা তো জানেন না—নতুন এসেছেন। এখানে কয়লা নেই, কাঠে রান্না করতে হয়, জল কিনতে হয়, এমনি সব আরোও অনেক কিছু আছে—ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারবেন।

শীলা দাঁড়িয়েছিল ও-ঘরে যাবার দোরের কাছে। অমরনাথ একবার তার দিকে তাকালেন। বললেন, শুনলে তো? আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। আন্দামান এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কলকাতা আর মাদ্রাজের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

সুন্দরম চা খেতে খেতে বললে, ঠিক তাই। আমি এখানে বিজ্‌নেস্ করতে এসে সব বুঝতে পেরেছি।

অমরনাথ হাসলেন। বললেন, এখানে যে ভাল বিজ্‌নেস্ চলতে পারে না সেইটিই শুধু বুঝতে পারেননি।

সুন্দরম কিন্তু সেকথা বুঝতে চায় না।

কথাটায় যেন সে কানই দিলে না। বললে, আমার বাপ-ঠাকুর্দ্দা সবাই বিজ্‌নেস্‌ম্যান ছিলেন, আমার রক্তের মধ্যে বিজ্‌নেস্। বিজ্‌নেস্ আমি করবই।

অমরনাথ এবার আর প্রকাশ্যে হাসতে পারলেন না। মনে মনে হাসলেন তার কথা শুনে।

হাসবার কথাই।

মিনতি বলেছিল, শীলা, সুন্দরমের সঙ্গে বেশি হেসে হেসে

কথা বলিস না। মাঝে মাঝে একটু ধমক্-টমক্ দিবি।

শীলা জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করে ও ?

মিনতি বলেছিল, বিজ্‌নেস করে। মানে বিজ্‌নেস-বিজ্‌নেস খেলা করে।

মিনতির সেই কথাটা মনে পড়তেই হেসে সেখানে থেকে সরে গিয়েছিল শীলা।

সে-হাসি কিন্তু সুন্দরমের চোখ এড়ায়নি।

শীলা সেকথা বুঝতে পারলে তার পরের দিন সন্ধ্যেবেলা।

পরেশ রান্না করেছিল। সকাল সকাল খেয়ে শীলা গিয়েছিল হাঁসপাতালে। ডাক্তার ভাদুড়ী তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন। হেল্‌থ্ ভিজিটারের কাজ। মাঝে-মাঝে পোর্ট-ব্লেয়ারের কাছাকাছি গ্রামগুলোতে যেতে হবে তাকে।

আশ্চর্য্য মানুষ এই ডাক্তারবাবুটি। এমন আপনভোলা মানুষ শীলা খুব কমই দেখেছে। আজ তিনি বলেন কিনা, তুমি বাড়ী বাড়ী করছিলে, আমি তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম—তুমি কোয়াটার পাবে।

হাঁসপাতাল থেকে ফিরে এসে এই কথাটা শীলা বলছিল অমরনাথকে।

সুন্দরম শুনতে পেলে।

শুনেই সে এসে দাঁড়ালো তাদের কাছে। বললে, তাহ'লে এ-বাড়ী কি আপনি ছেড়ে দেবেন ?

যেন বজ্রাঘাত হয়ে গেছে বেচারার মাথায় !

তার মুখের দিকে তাকিয়ে শীলা আবার ফিক্ করে হেসে ফেললে।

হেসেই তার মনে পড়লো মিনতির কথাটা। সুন্দরমের সামনে হাসতে তাকে সে বারণ করেছে। মুখখানা আবার গম্ভীর করে নিয়ে শীলা বললে, তা' কি করবো বলুন ! ফ্রি কোয়াটার যদি পাই—

সুন্দরম কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শীলা তাকে বলবার অবসরটুকু পর্যন্ত দিলে না। চলে গেল বাথরুমের দিকে।

গা হাত পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে শীলা বসেছিল চা করতে।

সুন্দরম এসে বসলো তার কাছে। বললে, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আপনার সঙ্গে। বলবো?

—বলুন।

সুন্দরম বললে, আমার এই বাড়ীটা একরকম খালিই পড়ে থাকে। ধরুন, আমি যদি আপনাদের কাছ থেকে ভাড়া না নিই, তবু কি আপনারা কোয়ার্টার পেলে চলে যাবেন এখান থেকে?

মিনতিকাতরকণ্ঠে এমন ভাবে কথাটা বললে সুন্দরম, শীলার সত্যিই দয়া হলো। বললে, আমরা থাকলে আপনি খুশী হন?

সুন্দরমের কালো মুখখানাও খুশীতে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জবাব দেবার মত কথা খুঁজে পাচ্ছিল না সে বললে, আই উইল বি মোর থ্যান্ গ্ল্যাড্।

শীলা বললে, আচ্ছা তাই হবে। থাকবো।

—কথা দিচ্ছেন?

—দিচ্ছি।

আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গিয়ে সুন্দরম বললে, আমি অমরনাথবাবুকে বলে আসি কথাটা।

এই বলে সে চট্ করে উঠে চলে গেল অমরনাথের কাছে।

অমরনাথ একটু রসিকতা করতে ছাড়লেন না।

সুন্দরমের সঙ্গে শীলার কাছে এসে তিনিও বসলেন চা খাবার জন্যে। হাসতে হাসতে বললেন, কৃপা তাহ'লে করলে এই জীবটিকে?

শীলা বললে, বেচারা সত্যিই কৃপার পাত্র।

সুন্দরম বললে, বাংলাটা আমি ঠিক বুঝতে না পারলেও বুঝতে পেরেছি।

এই বলে সে নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলো।

অমরনাথ তার পিঠে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, ছেলেটা সত্যিই ভালো! যে-জন্যে তোমার আন্দামানে আসা, সে-কাজটা যদি কেউ করতে পারে তো তোমার এই ভাসুরই পারবে।

সুন্দরম চট করে বলে বসলো, কি কাজ?

শীলার যে-কোনও কাজ করে দিতে পারলে যেন সে বাঁচে!

শীলা বললে, আমার ছোট ভাই পালিয়ে এসেছে আন্দামানে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

—ফটো একটা দিয়ে দেবেন, ঠিক বের করে দেবো।

অমরনাথ বললেন, ফটো নেই।

—না থাক্। এইরকম মুখ তো?

শীলা বললে, না। আমার মত মুখ নয়।

সুন্দরম ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, তবু বের করবো।

অমরনাথ বললেন, দেবীর কৃপালাভ করতে গিয়ে তোমার বিজ্‌নেসের—দেখলে? 'তুমি' বলে ফেললাম। তোমাকে 'আপনি' যদি না বলি, কিছু মনে করবে না তো?

সুন্দরম বললে, আমি অত্যন্ত খুশী হব। বিজ্‌নেসের কি বলছিলেন?

—শীলার ভাইকে খুঁজতে গিয়ে তোমার বিজ্‌নেসের ক্ষতি কোরো না যেন।

শীলা বললে, ওর আবার বিজ্‌নেস! বাপ্ মেলা টাকা রেখে গেছেন, কেমন করে খরচ করবেন খুঁজে পাচ্ছেন না! মিনতিদি আমাকে সব বলেছে।

সুন্দরম বললে, আমিও শুনেছি। মিসেস্ ডক্টর আমার নামে আপনাকে কি সব যেন বলছিলেন। তাই না শুনে আপনি হেসে ফেললেন তখন।

শীলা বললে, তাও আপনার নজরে পড়েছে?

—পড়বে না? বলুন না কী বলছিলেন উনি?

চায়ের কাপ দুটি দু'জনের হাতের কাছে ধরে দিয়ে শীলা বললে, আপনার বিজ্‌নেসের কথা।

সুন্দরম বললে, আমার বিজনেসের কথা উনি কিছু জানেন না। তাহ'লে শুনুন।

এই বলে চা খেতে খেতে সুন্দরম তার প্রথম বিজনেসের গল্পটি বললে। সে এক ভারি মজার গল্প।

ছেলেবেলায় সুন্দরম খুব পাখী ভালবাসতো। মাদ্রাজে বাড়ী। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে কে যেন একদিন তাকে বলেছিল—এই সমুদ্রের মাঝখানে আন্দামান নিকোবর নামে যে দ্বীপ আছে সেই দ্বীপে নানারকমের পাখী পাওয়া যায়। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ—কত রকমের কত পাখী! সেই কথাটা মনে তার এমনি দাগ কেটে গিয়েছিল যে বড় হয়েও কথাটা সে ভুলতে পারেনি। বাপ মারা যাওয়ার পর হাতে এলো তার অনেক টাকা। বাপ-ঠাকুর্দ্দা ছিল বড় ব্যবসাদার। সুন্দরমও ঠিক করলে ব্যবসা করবে। কিন্তু কিসের ব্যবসা করবে? প্রথমেই তার সেই বাল্যের স্মৃতি, কৈশোরের স্বপ্ন সফল করবার ইচ্ছে জাগলো। এলো আন্দামানে। সবার আগে এই বাড়ীখানা তৈরি করে ফেললে। মাদ্রাজ থেকে বাণ্ডিল-বাণ্ডিল তারের জাল এলো। দশজন কাঠের মিস্ত্রি মাসাবধি কাল ধরে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তৈরী করলে হাজার হাজার পাখী রাখবার বড় বড় খাঁচা। খাঁচা তৈরি হলো কিন্তু পাখীর সঙ্গে তখনও দেখা নেই। বাল্যকালে যে-সব রং-বেরংএর পাখী উড়েছিল তার মনের আকাশে, সেই সব পাখী ধরে আনবে হাজারে হাজারে, এইখানে এই বাড়ীর চিড়িয়াখানায় রাখবে তাদের, তারপর পাখীর কারবারী যারা—তাদের কাছে বিক্রি করবে অনেক বেশি দামে। ভারতবর্ষের পাখী চালান যাবে বিদেশে। বিদেশীরা তারিফ করবে, খুশী হবে, অর্ডার দেবে আর সে শুধু এইখানে বসে বসে সাপ্লাই করবে। এই

হবে তার প্রথম ব্যবসা। সবই হলো, এইবার চাই পাখী! কথাটা কাউকে তখনও সে ফাঁস করেনি। ট্রেড্ সিক্রেট্ কাউকে বলা উচিত নয়। সুন্দরম আন্দামানের গাছপালার দিকে তাকায়, নয়নাভিরাম সমুদ্রমেখলা এই দ্বীপটিকে তার বড় ভাল লাগে। কিন্তু রঙিন পাখী একটিও তার নজরে পড়ে না। ঝাঁকে ঝাঁকে দেখে শুধু সবুজ টিয়া। আছে আছে নিশ্চয়ই আছে। বনানী পরিবেষ্টিত এই দ্বীপের কতটুকুই-বা সে দেখেছে! কল্পনাবিলাসী তরুণ যুবকের চললো স্বপ্নাভিসার! দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ভি-এ সুন্দরম। নিকোবরে একদিন হঠাৎ দেখা হলো একজন চীনার সঙ্গে। একটি টিয়া পাখীকে সে কথা বলাবার চেষ্টা করছিল। এই লোকটির কাছে সুন্দরম তার মনের কথা খুলে বললে। মাঝ-বয়সী এই চীনা ভদ্রলোক, দেখতে ন্যালা-ক্যাবলার মত, কথাগুলোও কেমন যেন বাঁকা-বাঁকা। নাম—লিন্-টোয়াং। লিন্-টোয়াং বললে, আমার বাবা এই ব্যবসা করতো। কিন্তু এ বড় কঠিন ব্যবসা সায়েব, এ-খেয়াল তুমি ছেড়ে দাও।

—কেন? ছেড়ে দেবো কেন?

লিন্-টোয়াং বললে, আমার বাবা এখান থেকে পাখী নিয়ে গিয়ে সিঙ্গাপুরের এক খরিদ্দারকে দিত। লাভ বহুৎ, কিন্তু প্রাণের ভয় আছে। আমার বাবা এই করতে গিয়েই মরে গেল।

সুন্দরম জিজ্ঞাসা করলে, মরলো কেন?

লিন্-টোয়াং বললে, সে-পাখী তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না সায়েব, পাওয়া যায় গভীর জঙ্গলে—যেখানে হরিণ থাকে, বুনো শূয়োর থাকে, আর থাকে জংলী মানুষ—জারোয়া, উঙ্গি, যারা বাঘ-ভাল্লুকের চেয়েও নৃশংস। সভ্য মানুষ দেখলেই যারা জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে পড়ে, তারপর চোরাগোপ্তা তীর মেরে মানুষগুলোকে মেরে ফেলে। আমার বাবা সেই তীর খেয়েই তো মরে গেল। আমি সেদিন ছিলাম বাবার সঙ্গে।

—তারপর ?

লিন্-টোয়াং আবার বলতে লাগলো, বাবা মারা যাবার পর আমিও কিছুদিন চালিয়েছিলাম পাখী ধরার ব্যবসা, কিন্তু অনেক লোক নিয়ে যেতে হয়, জাল নিয়ে যেতে হয়, অনেক টাকার দরকার। আমার টাকা নেই, তাই ছেড়ে দিয়েছি ও মারাত্মক কাজ।

সুন্দরম বললে, ধরো টাকা যদি আমি দিই ?

লিন্-টোয়াং বললে, না সায়েব, অত টাকা তুমি আমাকে বিশ্বাস করে দেবে কেন ? এ মতলব ছেড়ে দাও।

সুন্দরমের তখন জেদ চেপে গেছে। বললে, কত টাকা চাও তুমি বল। নো রিস্ক, নো গেন্।

লিন-টোয়াং বললে, প্রথমেই বেশি খরচ। দল তো ভেঙ্গে দিয়েছি, আবার সব ডেকেডুকে জড়ো করতে হবে। হাজার-পাঁচেক টাকা যদি খরচ করতে পারো তো না হয় দেখি আবার চেষ্টা করে।

সুন্দরম দিলে তাকে পাঁচ হাজার টাকা।

দিন-পনেরো পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা লিন্-টোয়াং এসে হাজির! সঙ্গে জন-পাঁচেক লোক, আর তাদের কাঁধে বাঁশের তৈরি খাঁচার ভেতর একশ'টি রং-বেরংএর টিয়াপাখী। লাল, হলদে, কালো, বেগ্নী—নানারঙের পাখী দেখে সুন্দরম আনন্দে একেবারে যেন লাফিয়ে উঠলো।

লিন্-টোয়াং তাকে হিসেব বুঝিয়ে দিলে।—এক একটি পাখী যদি তুমি পঁচিশ টাকায় বিক্রি কর তো হিসেব করে ছাখো তোমার কত লাভ হবে।

—পঁচিশ টাকায় বিক্রি হবে না।

—হবে। এরা দেখতে টিয়ার মত, কিন্তু 'বেয়ার বার্ডস্'।

লিন্-টোয়াং বললে, আর একটু হলে মরে গিয়েছিলাম। একটা ঝাঁক ছিল—তারা এর চেয়েও ভাল। আমাদের জাল দেখে

পাখীগুলো আরও গভীর জঙ্গলের ভেতর উড়ে গেল। আমি ছুটে-ছিলাম পিছু-পিছু। পড়ে গেলাম তিনজন জারোয়ার সাম্‌নে। আমি ওদের ভাষা জানি তো! তাই বেঁচে গেলাম। আর একবার চেষ্টা করব। এ-ঝাঁকে কিন্তু হাজার-দু'হাজার পাখী আছে। আপনি নেবেন?

সুন্দরম একটু অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে, আমি নেবো না তো কে নেবে?

লিন্‌-টোয়াং বললে, অত টাকার ঝক্কি আপনি যদি না নিতে চান তো আমি বরং একবার আমাদের পুরনো খদ্দেরের কাছে সিঙ্গাপুরে যাই।

সুন্দরম বললে, না। আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব না। আপনি সব পাখী আমাকে দেবেন।

লিন্‌-টোয়াং এবার নিয়ে গেল দশ হাজার টাকা।

পাঁচ রকমের পাঁচটি পাখী নিয়ে সুন্দরম গেল কলকাতায়।

পাখীর বাজারে হৈ চৈ পড়ে গেল। এরকম অদ্ভুত টিয়া তারা কখনও দেখেনি। সুন্দরম বললে, 'বেয়ার স্পেসিমেন'।

প্রতিটি পাখীর দাম ঠিক হলো কুড়ি টাকা।

পাখীওলা বললে, পাখী রেখে যান। কাল দাম দেবো।

সুন্দরম একটি রসিদ নিয়ে চলে এলো।

পরের দিন সুন্দরম গেল টাকা আনতে। আরও অনেক পাখী সে দিতে পারবে—তারও একটা অর্ডার নিয়ে আসবে—এই ছিল তার মনের বাসনা।

ট্যাক্সি থেকে নেমে হাসতে হাসতে সুন্দরম গিয়ে দাঁড়ালো পাখীওলার কাছে।

পাখীওলা গম্ভীরমুখে বললে, আমার রসিদটা দিন।

রসিদটা হাতে নিয়েই পাখীওলা সুন্দরমের দিকে হাত বাড়ালে। সুন্দরম ভেবেছিল আনন্দে বোধ হয় লোকটা হ্যাণ্ডসেক্ করবে।

কিন্তু অবাক্ হয়ে গেল সুন্দরম তার ব্যবহার দেখে।

সুন্দরমের হাতখানা চেপে ধরে পাখীওলা বললে, চলুন থানায় চলুন।

—কেন? থানায় কেন?

লোকটা বললে, তোমাকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেবো। পাখীর গায়ে রং ধরিয়ে তুমি আমাদের ঠকাতে এসেছিলে?

সুন্দরমকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার পাখী পাঁচটি তাকে সে দেখিয়ে দিলে। সবুজ টিয়া আবার তেমনি সবুজ হয়ে গেছে। মাত্র একটি পাখীর গা থেকে রং তখনও তোলা হয়নি।

লোকটা বললে, ওটা রেখে দিয়েছি পুলিশকে দেখাব বলে।

সর্ব্বনাশ!

লিন্-টোয়াং জোচ্চোর!

পাখীওলা বললে, পাখীর ডানায় রং সহজে ধরে না। তুমি কেমন করে রংটা ধরালে সেইটে যদি বলে দাও তো তোমাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি।

শেষে অনেক কাকুতি-মিনতি করে, হাতে পায়ে ধরে, তাদের হাত থেকে ছাড়া পেলে সুন্দরম।

ছাড়া পেয়ে ফিরে এলো আন্দামানে।

তারপর চললো তার লিন-টোয়াংএর অনুসন্ধান।

খুঁজতে কোথাও বাকি রাখলে না সুন্দরম। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

পাখীর কারবারী লিন-টোয়াং তখন পাখীর মতই উড়ে পালিয়েছে।

আগাগোড়া গল্পটা বলেই হো হো করে হাসতে লাগল সুন্দরম। হাসতে হাসতে বললে, এই আমার ফার্ষ্ট বিজ্‌নেস্।

পরের দিন অমরনাথ বললেন, আমি যাচ্ছি বংশীদার খোঁজে।

দেখি সেখানে বিশুর কোনও সন্ধান পাই কিনা।

শীলা বললে, অচেনা পথ-ঘাট। পথ চিনে যেতে পারবে তো ?

—না পারি, এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে আসব।

—তার চেয়ে এক কাজ করলে পারতে। শীলা বললে, ভাসুরের কাজকর্ম্ম কিছু নেই, মোটর-বাইক্ আছে, পেছনে চড়িয়ে তুমি যেখানে বলতে ও তোমাকে নিয়ে যেতে পারতো।

অমরনাথ মুখ টিপে হাসলেন একবার। বললেন, রক্ষে কর! সারাটা পথ বক্ বক্ করতে করতে যাবে, বিজ্‌নেসের কথা আরম্ভ করলে আর শেষ হতে চাইবে না। তার চেয়ে ছেলেটা ভাল, ওকে তুমি তোমার বাহন করে নাও।

শীলা বললে, উঁহুঁ, আমাকে বহন করবার ক্ষমতা ওর নেই। ও হবে আমার আজ্ঞাবহ।

—বেচারা! বলে সুন্দরমের প্রতি একটু অনুকম্পা প্রকাশ করে অমরনাথ বেরিয়ে পড়লেন হারবাটাবাদের দিকে।

বেচারাই বটে!

সেইদিনই সন্ধ্যার কিছু আগে, শীলা একটু সকাল-সকাল বাড়ীতে ফিরে কাপড়-চোপড় ছেড়ে চা খেয়ে মিনতিদির বাড়ী যাবে বলে তৈরী হচ্ছে, এমন সময় মোটর-বাইকের শব্দে সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলে, সুন্দরম আসছে হাসতে হাসতে।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, হাসছো যে ? কি খবর ?

সুন্দরম বললে, কি খাওয়াবেন বলুন।

—এরই মধ্যে খাওয়াবার মত কী এমন কাজ করলে ?

সুন্দরম বললে, আপনার ভাইএর নাম বিশু তো ?

শীলা একটু অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে, এরই মধ্যে বিশুর খবর তুমি নিয়ে এলে ?

—জরুর। শুধু খবর কি বলছেন মিস্, আপনার ভাইকে আমি ধরে এনেছি সঙ্গে করে।

—সে কি ?

আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে শীলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।—কোথায় ?

সুন্দরম বললে, দেখুন না, আসছে।

আমি বললাম, বাইকের পেছনে চড়ে বসুন, তাড়াতাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, তা উনি বসলেন না কিছুতেই। বললেন, না আমি—ওই তো এসে গেছেন।

ফটকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সুন্দরম যে-মানুষটিকে দেখিয়ে দিলে সে বিশু নয়, চন্দন চ্যাটার্জি।

সত্যিই অবাক হয়ে গেল শীলা।

বাড়ী চিনে এ-লোকটি এখানে এলোই বা কেমন করে, আর সুন্দরমের কাছে বিশুই-বা কেমন করে হলো ? আশ্চর্য !

সুন্দরমের কাছ থেকে একটু দূরে সরে যাবার জন্যই বোধকরি শীলা বাগানের রাস্তা ধরে চন্দনের দিকে এগিয়ে গেল।

পেছন থেকে সুন্দরম বলে উঠলো, পেয়েছেন তো ?

শীলা পেছন ফিরে হাত তুলে বললে, থ্যাঙ্ক ইউ !

চন্দন জিজ্ঞাসা করলে, কী পেয়েছেন ?

শীলা বললে, আপনাকে।

—আমাকে পাওয়া অত সহজ নয়।

শীলা বললে, এটা অহঙ্কারের কথা। নিজেকে এত দুর্লভই-বা ভাবছেন কেন ?

—ভাবিনি। এইটেই সত্যি কথা।

—আজ্ঞে না। ওটা নিজের দর বাড়াবার ছুতো।

এই কথা ব'লেই হাসতে হাসতে শীলা জিজ্ঞাসা করলে, আপনার নাম কি বিশু ? আপনি বিশু হয়ে এলেন কেন ?

—আপনি বিশুকে চাইছেন বলে'। যে যা চায় তার কাছে তাই হয়ে আসাই নিরাপদ।

—যে রং এত তাড়াতাড়ি বদলায়, সে-রং তো কাঁচা।

—কাঁচা কি পাকা রং যে চেনে সে ধরতে পারে।

—চোখের দেখায় ধরা শক্ত। সাবান দিয়ে কেচে আছাড় মারতে হয়।

—তাই মারুন।

—মজুরি পোষাবে না।

কথা কইতে কইতে ফটক পেরিয়ে তারা ঠিক সেই জায়গায় এসে পড়লো—যেদিক দিয়ে মিনতিদি সেদিন তার বাড়ী গিয়েছিল। গাছের ছায়ায় ঘেরা জায়গাটা বড় মনোরম। শীলা বললে, রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার চেয়ে এইখানে একটু বসা যাক্।

চন্দন বললে, নিশ্চয়ই। অপরিচিত মানুষের সঙ্গে বেশি দূরে যাওয়ার চেয়ে বাড়ীর কাছাকাছি থাকাই ভাল।

পকেট থেকে বড় একটা রঙিন রুমাল্ বের করে গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর পেতে দিয়ে চন্দন বললে, বসুন।

কিন্তু বসতে গিয়েও শীলা বসলো না। ভাবলে হঠাৎ যদি মিনতিদি এসে পড়ে এই পথ দিয়ে ? একে তো তাকে সে সন্দেহের চোখেই দেখেছে, তার ওপর আজ যদি এই অপরিচিত যুবকের সঙ্গে তাকে এমন নিভৃতে বসে থাকতে দেখে তাহ'লে হয়ত' সে তার সঙ্গে আর কোনও সম্বন্ধই রাখতে চাইবে না। তার চেয়ে বাড়ীতে গিয়ে বসাই ভালো। সুন্দরমের ভুলটা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত।

বসতে ইতস্তত করছে দেখে চন্দন বললে, চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আমি চলে যাই। সত্যিই তো, এত সাহস ভাল নয়।

শীলা মুখ তুলে তাকালে চন্দনের মুখের দিকে। চোখে তার চোখ পড়ে গেল। দেখবার মত চোখ! কীরকম যেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে ওই চোখের শীলার দৃষ্টিতে ঠোঁটের ফাঁকে সলজ্জ একটুখানি হাসি দেখা গেল। বললে, ভাল তো নয়ই! চলুন।

চন্দন হেঁট হয়ে তার রুমালটা তুলতে তুলতে বললে, আমার রুমালটার ভাগ্য ঠিক আমারই মতন।

বলেই রুমালসুদ্ধ হাতখানা বাড়িয়ে চট্ করে শীলার একখানা হাত সে ধরে ফেললে। শীলা শিউরে উঠলো। কিন্তু হাতখানা সরিয়ে নিতে পারলে না। জাগ্রত যৌবনের যে স্বাভাবিক উত্তেজনা মানুষের বিচার-বিবেচনাকে, মানুষের শুভবুদ্ধিকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে দেয়, শীলাও বোধ করি তেমনি একটা মোহাবর্তে পড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। বুকের ভেতরটা তখন তার থর থর করে কাঁপছে। কি করবে—কি তার করা উচিত, কিছুই সে বুঝতে পারছে না। চন্দন তার এই বিহ্বলতার সুযোগ নিয়ে শীলার হাতখানা তার দু'হাত দিয়ে আরও জোর করে চেপে ধরে বললে, শেষ পর্যন্ত তোমারই কাছে আমাকে হার মানতে হলো।

এই বলে সে যখন তার একখানা হাত বাড়িয়ে শীলাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে এনে তার মুখখানা শীলার মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল, তখন যেন চমক ভাঙলো শীলার। চন্দনকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে, আসুন।

দু'জনেই এগিয়ে চললো বাড়ীর দিকে।

চন্দন চাপা গলায় বললে, রাগ করলে?

শীলা চুপ করে রইলো। তার রুচিবোধে কোথায় যেন আঘাত লেগেছে। কথা বলতে পারছে না সে।

চন্দন আবার বললে, কথা বলছো না যে?

শীলা তার মুখের দিকে না তাকিয়েই বললে, ডাকাতি আমি পছন্দ করি না।

—তবে কি চুরি ভালবাসো?

—না। ঘৃণা করি।

চন্দন মনে মনে একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তার জীবনে

এরকম ঘটনা বড়-একটা ঘটেনি। এইখানেই বোধকরি তার প্রথম ব্যর্থতা।

আন্দামানে সন্ধ্যার অন্ধকার একটু দেরিতে নামে। তখনও চারিদিক পরিষ্কার। বাড়ীর ফটকের কাছে এসে চন্দন বললে, অপরাধ যদি করে থাকি তো ক্ষমা কোরো। আমি চলি।

সত্যিই সে চলে যাচ্ছিল। শীলাই তাকে টেনে আনলে। বললে, তাই কখনও হয়? এসো।

'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলেছে শীলা। এতক্ষণ পরে চন্দন 'যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বললে, চল।

সুন্দরম যেন তাদেরই জন্য অপেক্ষা করছিল। শীলাকে ফিরে আসতে দেখে বলে উঠলো, হলো তো? বিশুকে পেলেন তো ফিরে? আমার ওপর যে কাজের ভার দেবেন আমি 'তুরন্ত্' করে ফেলবো দেখবেন।

সুন্দরমের উৎসাহের অন্ত নেই! বললে, বসুন আপনারা। দু'ভাই-বোনে গল্প করুন, আমি আপনাদের চায়ের ব্যবস্থা করি।

এই বলে সে পরেশকে ডাকবার জন্যে উঠে গেল।

চন্দন চুপিচুপি শীলাকে জিজ্ঞাসা করলে, একে জোটালে কোত্থেকে?

শীলা বললে, ওরই এই বাড়ী আমরা ভাড়া নিয়েছি।

—নিজেও তো থাকে এইখানে?

—থাকে।

—মেয়েছেলে?

—নেই। বিয়েই করেনি। মানুষটি কিন্তু খুব ভাল।

চন্দন বললে, দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার একজন অনুরাগী ভক্ত।

কথাটা বেশিদূর এগুলো না, কারণ সুন্দরম সব ব্যবস্থা করেই ফিরে এসে বসলো।

শীলা বললে, শোনো ভাস্কর, যাকে তুমি বিশু ভেবে খুব আনন্দ করছ, আসলে সে কিন্তু বিশু নয়!

—সে কি রকম কথা? আমাকে দেখেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে শীলা বলে একটি মেয়ে নতুন এসেছে কলকাতা থেকে—হাঁসপাতালে চাকরি করে; তার বাসাটা এখানে কোথায় বলতে পারেন? আমি বললাম, পারি। কিন্তু আপনার নাম কি বিশু? উনি বললেন, হ্যাঁ!

এই বলে সুন্দরম তাকালে চন্দনের দিকে। স্পষ্ট তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, আপনি তাহলে মিথ্যা কথা বলেছেন?

প্রথম থেকেই এই লোকটির প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিল না চন্দন। প্রসন্ন না হবার কারণ শীলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। এই ঈর্ষার আগুন মানুষ বেশিক্ষণ মনের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। এক সময় না এক সময় সে আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠবেই।

চন্দন কেমন যেন অবজ্ঞাভরে জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ও-রকম ছোট-খাট দু' একটা মিথ্যা কথা আপনিও বলে থাকেন, আমিও বলি।

কথাটা শুনে কেন জানি না সুন্দরমও খুব খুশী হলো না। বললে, আপনি শীলা দেবীর বিশেষ পরিচিত, তার ওপর আমার বাড়ীতে বসে রয়েছেন, আপনাকে কিছু বলা আমার অন্যায়। তবু বলছি, অপরের সম্বন্ধে যখন কিছু বলবেন—একটু ভেবেচিন্তে বলবেন।

শীলার দিকে তাকালে চন্দন। বললে, লোকটি পাগল নাকি? আমি আবার কখন কি বললাম?

সুন্দরম বললে, বলেছেন বই-কি! মিথ্যা কথা আপনি বলতে পারেন, আমি বলি না।

মনের বেদনা মনে চেপে রাখতে চন্দন জানে! তাছাড়া এই

সামান্য কথার সূত্র নিয়ে সদ্য পরিচিত শীলার এই বাড়ীওলার সঙ্গে ঝগড়া করাটা যে তার পক্ষে অন্যায়, সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি তার যথেষ্টই আছে। তাই সে সুন্দরমের কথাটা শুনে এমন হো হো করে হেসে উঠলো যে সেই হাসির হাওয়ায় মনে হলো সুন্দরমের মনের ক্ষোভ নিমেষের মধ্যে কোন্‌দিক দিয়ে যেন উড়ে গেল।

চন্দন বললে, সব কথা আপনি অত সিরিয়াস্‌লি ধরেন কেন? আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম বিশু? আমি ধাঁ করে বলে বসলাম, হ্যাঁ। তা নইলে বিশু-না-চিস্থু কে-না-কে—

সুন্দরম বাধা দিলে। কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলো, ওরকম করে বলবেন না। বিশু যে মিস্ শীলা দেবীর ভাই! সেই ভাইএর খোঁজেই উনি কলকাতা থেকে আন্দামানে এসেছেন—আপনি জানেন না?

চন্দন বললে, জানি।

—তা তো জানবেনই। আমিই বরং জানতাম না। আমার সঙ্গে ক'দিনেরই-বা পরিচয়। এখানে কোথায় থাকেন আপনি?

চন্দন বললে, থাকি অনেক দূরে। তবে প্রায়ই আমাকে আসতে হয় পোর্টব্লেয়ারে।

—কি করেন?

চন্দন বলে বসলো, বিজ্‌নেস্।

সুন্দরম বিজ্‌নেসের নামে পাগল। জিজ্ঞাসা করলে, কিসের বিজনেস্?

বলেই সে তার চেয়ারটাকে একটু টেনে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে এলো।

চন্দন একটু ইতস্তত করছে দেখে সুন্দরম বললে, বলতে আপত্তি আছে?

—আজ্ঞে না, আপত্তি কিছু নেই। তবে আমার এই বিজনেসের যিনি পার্টনার তিনি বলেন, এই কারবারটা যত কম

লোক করে ততই ভাল। তাই চুপচাপ থাকি, কাউকে কিছু বলি না।

সুন্দরম বললে, বুঝেছি। সি-পি বিজনেস্। বলুন ঠিক বলেছি কিনা?

চন্দন হেসে মাথা নাড়লে।

—দেখুন, আমার রক্তের মধ্যে বিজনেস্। বিজনেসের কথা আমি চট্ করে ধরে ফেলতে পারি। আপনাদের নিজের ষ্টিমার আছে?

চন্দন বললে, আছে।

—প্রফিট্ বেশ ভাল। না?

—হ্যাঁ।

—ফরেনে পাঠান?

—পাঠাই?

—তবে জাপানই বেশি নেয়: কি বলেন?

চন্দন হাসতে হাসতে বললে, এই তো সবই আপনি জেনে নিচ্ছেন। আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমি বলব না কিন্তু।

এবার সুন্দরম হেসে উঠলো হো হো করে। বললে, তবে শুনুন। লাইসেন্সের জন্যে আমি একটা দরখাস্ত করেছি!

শীলা উঠে দাঁড়ালো।—পরেশ তোমার কী করছে! এখনও চা এলো না কেন?

এই বলে সে উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দিলে।

আলোর ছটা গিয়ে পড়লো সুমুখের রাস্তায়।

দেখা গেল, অমরনাথ আসছেন।

তাঁকে আসতে দেখেই শীলা চট করে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

চন্দনকে এরকমভাবে বসে থাকতে দেখবেন অমরনাথ সেকথা

ভাবতেও পারেননি ! শীলার চলে যাবার কারণটা বুঝতে তাঁর দেরি হলো না।

চন্দন উঠে দাঁড়িয়েছিল। অমরনাথ বললেন, বসুন, বসুন। আপনি তাহলে এসেছেন শেষ পর্যন্ত। আপনার কয়েকটা টাকা পাওনা আছে। সেটা এক্ষুনি দিয়ে দিই নইলে ভুলে যাব।

বলেই তিনি পকেট থেকে মণিব্যাগ বের কবে জিজ্ঞাসা করলেন, ট্যাক্সিওলাকে কত দিয়েছিলেন সেদিন ?

চন্দন বললে, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমি কি সেই টাকাটা আদায় করবার জন্যেই এসেছি ভাবছেন নাকি ?

—না, তা অবশ্য ভাবিনি। তবে কিনা কারও একটা পয়সা ধার থাকলে রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় না !

এই বলে পাঁচ টাকার একটি নোট তিনি চন্দনের হাতে দিয়ে বললেন, আন্দাজি দিচ্ছি। এর চেয়ে বেশি হয় তো বলুন।

চন্দন হেসে বললে, যদি কম হয় ?

—ফেরত দেবেন।

বলে যেই তিনি বাড়ীর ভেতরে যাবার জন্যে পেছন ফিরেছেন, দেখলেন হাস্যাধরা শীলা আসছে চা নিয়ে। পেছনে পরেশ। পরেশের হাতে গরম পাঁপর ভাজা।

শীলা বললে, তাড়াতাড়ি আসুন।

—বুঝেছি। লোভনীয় জিনিস, বঞ্চিত হবার আশঙ্কা আছে।

শীলা চোখ তুলে চাইলে জামাইবাবুর দিকে। তাইতেই বুঝিয়ে দিলে—ইঙ্গিতটা সে বুঝেছে।

যাবার সময় অমরনাথ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন।

—তা হোক্। অতিথি সৎকারের পুণ্য হবে।

ফিরে আসতে তাঁর দেরি হলো না। হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে অমরনাথ এসে বসলেন চন্দনের মুখোমুখি। সুন্দরমের দিকে তাকিয়ে বললেন, দু'জনের পরিচয় হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

সুন্দরমের বেশ হাসিখুশি মুখ। বললে, হাঁ হাঁ, উনিও বিজনেস্ করেন, আমিও বিজনেস্ করি।

—বাণিজ্য ?

দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলো, হ্যাঁ।

—লক্ষ্মী তো ওইখানেই বাস করেন। অমরনাথ বললেন, এবার তাহ'লে লক্ষ্মীলাভের প্রতিযোগিতা চলবে বুঝতে পারছি।

অমরনাথ তাকালেন শীলার দিকে।

পাঁপরের ডিসটা তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিতে গিয়ে শীলার নজরে পড়লো। শীলা বললে, তা আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন ?

—কেন তাকাচ্ছি তা তুমি জানো।

—জানি তো জানি। তুমি এখন খাও তো। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অমরনাথ বললেন, তুমি নিজে তো খাচ্ছ না ? এমনি পরিবেশন করে খাওয়াতো সেকালের মেয়েরা। তুমি আধুনিকা, তুমি একসঙ্গে বসে বসে খাবে।

শীলা বললে, না, আমি পরে যাব।

—তোমার বুঝি কিছুতেই অরুচি নেই। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও চলবে ?

শীলা এতক্ষণে বোধকরি একটুখানি রাগ করলে। বললে, হঠাৎ তুমি আমার পেছনে লাগলে কেন বল তো ?

কথাটা বলেই তার মনে হলো—চন্দন বসে রয়েছে এ সময় কথাটা বলা তার উচিত হলো না। চট্ করে কথাটা সে পালটে নিলে। বললে, তোমার বংশীদার সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করে এলে নাকি ?

অমরনাথও বুঝলেন ব্যাপারটা। বললেন, না, ঝগড়া করিনি। একটা কথা শুধু জেনে এলাম—আন্দামান এখনও সুখে-স্বচ্ছন্দে

বাসের যোগ্য হয়নি। তবে আমাদের সরকার যেরকম উঠে পড়ে লেগেছে, আন্দামানকে বাসযোগ্য করতে বেশি দেরি হবে বলে মনে হয় না।

সুন্দরম বলে উঠলো, কেন? এ জায়গা তো খুব ভাল।

অমরনাথ বললেন, সে-সব কথা তুমি বুঝবে না সুন্দরম। তোমার অনেক টাকা, যখন যেটি দরকার হচ্ছে যত টাকাই দাম হোক্ কিনে নিচ্ছ। কাজেই সাধারণ মানুষ যারা—যারা গরীব, তাদের দুঃখকষ্ট তুমি বুঝতে পারবে না। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এইখানে তৈরি করতে হবে। প্রথমে এখানকার মাটি থেকে আদায় করতে হবে ধান, তুলো, সরষে, আখ, আলু, কফি, গম, যব, কলাই, নানা রকমের ফল, ফুল। আন্দামানকে কলকাতা আর মাদ্রাজের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষুকের মত হাত পেতে থাকলে চলবে না। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। তারপর আন্দামানকে কিছু রোজগার করতে হবে বাইরের বাজার থেকে। তৈরি করতে হবে কফি, কাজুবাদাম, রাবার, নারকেল তেল, নারকেলের দড়ি, গদির ছোব্ড়া। এমনি সব নানান রকম প্ল্যান্ আমার মাথায় আসছিল।

চন্দন এতক্ষণ অমরনাথের কথাগুলো চুপ করে শুনছিল। প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবার জন্যই বোধকরি বলে বসলো, গভর্ণমেন্ট খুব চেষ্টা করছে। দু'চার বছরের ভেতরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অমরনাথ বললেন, সেইখানেই আমার দুর্ভাবনা সব চেয়ে বেশি। যত তাড়াতাড়ি হবে ভাবছেন, তত তাড়াতাড়ি হবে না।

সুন্দরম জিজ্ঞাসা করলে, কেন হবে না?

শীলা মুখ টিপে একটু হাসলে। বললে, ছাত্র দুটি ভাল পেয়েছ তুমি। আসছি।

বলেই টি-পটটি হাতে নিয়ে শীলা ভেতরে চলে গেল।

সুন্দরম আবার অমরনাথকে ধরে বসলো।—কেন হবে না বলুন। গভর্ণমেণ্ট তো অনেককিছু করছে।

অমরনাথ বললেন, সেই করার পেছনে থাকে আত্মাভিমানের দম্ভ। তাই ভয় হয়। এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই আমি জানি না। কিন্তু অন্যত্রে দেখেছি, গভর্ণমেণ্টের হয়ে যাঁরাই কিছু করতে গেছেন, তাঁরাই যেন অনেক উঁচুতে উঠে জনগণের দিকে কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। অনেককে দেখেছি কেমন যেন 'বৎস' বর প্রার্থনা কর!'—গোছের মনোভাব। তাঁরা চোখ দিয়ে দেখেন, কান দিয়ে শোনেন, কিন্তু হৃদয় দিয়ে কোনও কিছুই অনুভব করেন না। তা যদি করতেন, তাহ'লে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যেতো।

চন্দনের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। সে যেন আর বসে থাকতে পারছিল না। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, অনেক দূর যেতে হবে। আমি চলি।

এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে দু'জনকে দুটি নমস্কার করলে। প্রথমে একটি নমস্কার করলে অমরনাথকে। পরে করলে সুন্দরমকে।

মনে হলো যেতে যেন সে একটু ইতস্তত করছে।

অমরনাথ বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরেও শীলাকে ডেকে দিলেন না।

তখন বাধ্য হয়ে তাকে বেরিয়ে পড়তে হলো।

কাঁকর-বিছানো রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়ে ফটক। চন্দন ফটকের কাছে একবার থমকে থামলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে—শীলাকে কোথাও দেখা যায় কি না!

দেখলে, এ-বাড়ীর রান্নাঘরটা একটু দূরে। টিনের একখানা ছোট্ট ঘর। আর সেই ঘরের সুমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীলা চা খাচ্ছে। একবার ভাবলে তাকে ডেকে যাবার সময় দুটো কথা বলে

যায়। কিন্তু অতিকষ্টে সে লোভ সম্বরণ করলে চন্দন। তারপর তার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী হন্ হন্ করে বেরিয়ে চলে গেল গেট পেরিয়ে। ভাবলে, ঠিক হয়েছে। শীলা তাড়াতাড়ি গরম চা'টা গিলে এক্ষুনি হয়ত যাবে বাইরের ঘরে যেখানে তারা বসেছিল। গিয়ে দেখবে সে চলে গেছে। হয়ত'-বা চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারই কথা সে ভাববে। হয়ত'-বা সারারাত জেগেই কাটাবে। কাটাক্। এই কিছুক্ষণ আগে ওই গাছের তলায় চন্দনের সহৃদয় আলিঙ্গনের ব্যাকুলতাকে সাদরে অভিনন্দিত করা দূরে থাক, অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করতেও কুণ্ঠিত হয়নি যে-মেয়ে, তখুনি তার চলে যাওয়া উচিত ছিল তার কাছ থেকে। তার এই ঔদাসীন্যই হোক্ তার প্রত্যাখ্যানের প্রত্যুত্তর।

॥ **চার** ॥

ঔদাসীন্য শুধু দেখিয়ে আসাই সার হলো। উদাসীন থাকতে পারলে না চন্দন। সারারাত তার ঘুম হলো না।

ঘুম আসবে কেমন করে? পরিপূর্ণ যৌবনা মনমোহিনী শীলা তার দুই চোখে মাখিয়ে দিয়েছে মোহ অঞ্জন। তার তৃষ্ণার ব্যাকুলতাকে ধিক্কারে তিরস্কৃত করেও শীলা যেন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সে তার অনুরাগিনী।

চন্দন তার নিজের মন দিয়ে বিচার করে শীলার সে তিরস্কারকে উড়িয়ে দিলে। ভাবলে বুঝি ওটা তার নারীসুলভ লজ্জা।

পরের দিন বিকেল না হ'তেই সে বেরিয়ে পড়লো।

শীলার সেদিন হাঁসপাতাল থেকে বেরোতে একটু দেরি হয়েছিল। বাইরে বেরিয়েই দেখে একটা গাছের তলায় চন্দন দাঁড়িয়ে।

শীলা সত্যিই একটু অবাক হয়ে গেল। কারণ এত শীঘ্র এরকম ভাবে তাকে সে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে তা সে ভাবতেই পারেনি।

শীলা হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো তার কাছে।

—কাল যে বড় না দেখা করে চলে গেলেন?

—সেই জন্যেই তো এই অসময়ে ফিরে এলাম।

—বাড়ী যাননি?

—কই আর গেলাম!

—কোথায় ছিলেন?

—ধরো এমনি একটা গাছের তলায়।

—ধেৎ! বড্ডো হেঁয়ালী করে কথা বলেন আপনি। বলুন না, রাতটা কোথায় কাটালেন?

—বললেই বুঝতে পারবে? পোর্ট ব্লেয়ারের তুমি সব-কিছু চেনো?

শীলা বললে, না।

—তবে? শুধু জেনে রাখো, সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি।

—কেন?

—তোমার কথা ভেবে।

—যাঃও!

পাশাপাশি হাঁটতে আরম্ভ করেছিল তারা দু'জনেই। রাস্তার ধারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। চন্দন সেইখানে এসে থমকে থামলো। ট্যাক্সির দরজাটা খুলে ধরে চন্দন বললে, ওঠো।

শীলা বুঝলে সে গাড়ী নিয়ে এসেছে। গাড়ীতে উঠতে একটু ইতস্তত করে বললে, গাড়ীটা ছেড়ে দিলেই হতো। এইটুকু তো পথ! হেঁটে হেঁটেই চলে যেতাম।

শীলার হাতে ধরে একরকম জোর করেই তাকে সে গাড়ীতে তুললে। বললে, ওঠো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

ড্রাইভার পেছন ফিরে তাকাতেই চন্দন বললে, কারবাইন কোভ্।

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

শীলা বলে উঠলো, আরে, সে আবার কোথায় ?

চন্দন বললে, চল না ! দেখবে কেমন জায়গা।

—কিন্তু সেই সকালে বেরিয়েছি, এই আমার পোষাক, বাড়ী যাব, কাপড়চোপড় বদলাবো—

চন্দন বললে, থাক্ আর বাড়ীর কথা বোলো না। তোমার বাড়ীতে কোনও কথা হয় না।

এই বলে শীলার একখানি হাত সে তার কোলের ওপর তুলে নিয়ে তার ওপর ধীরে-ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, তোমার একটুখানি কষ্ট হবে জানি। কিন্তু কাল সারারাত, আজ সারাটা দিন···

সামনে ড্রাইভার বসে গাড়ী চালাচ্ছে। শীলা তার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে তার বাঁহাত দিয়ে চন্দনের হাতটা চেপে ধরে কথাটা তাকে শেষ করতে দিলে না।

চন্দন অন্য কথা পাড়লে।

—বেশ জুটিয়েছ ওই লোকটাকে !

শীলা বললে, কার কথা বলছেন ? সুন্দরম ?

চন্দন বললে, না ; কুৎসিতম্।

শীলা হাসতে গিয়েও হাসতে পারলে না। বললে, লোকটি ভাল।

—ভাল নয়, বল বোকা।

এই বলে একটুখানি থেমে কি যেন ভেবে চন্দন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি সত্যিই জানো ওর অনেক টাকা আছে ?

শীলা বললে, জানি।

চন্দন বললে, তাহ'লে ওকে বলতে পার আমার বিজনেসে ওকে আমি আমার পার্টনার নিতে পারি।

—আমি বলতে পারব না। আপনি বলবেন।

চন্দন তার মুখখানা শীলার কানের কাছে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বললে, তোমার সঙ্গে আমি আর কথা বলব না।

—কেন ?

তেমনি চুপিচুপি জবাব দিলে চন্দন।—তুমি এখনও আমাকে 'আপনি' বলছো।

চন্দনের মুখের দিকে চোখটা তুলে শীলা ম্লান একটুখানি হাসলে শুধু।

পথের একদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর পাহাড়ের ওপর শ্রেণীবদ্ধ অজস্র নারকেলের গাছ ; আর একদিকে সমুদ্র। তারই মাঝখান দিয়ে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে আঁকাবাঁকা একটি পথের ওপর দিয়ে তাদের গাড়ী চলেছে সামনের দিকে। কোথায় চলেছে শীলা কিছুই জানে না। স্নিগ্ধ সুন্দর হাওয়া এসে লাগছে চোখে মুখে। কত রকমের কত পাখীর ডাক শুনছে। দূরে কোথায় যেন একটা কোকিল ক্রমাগত ডেকে চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আবছা আলো-অন্ধকারের এই অভূতপূর্ব্ব শোভা আর এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপপুঞ্জের অভাবনীয় লাবণ্যের মাঝখান দিয়ে তার এই অভিসার যাত্রা। যে-পৃথিবীকে সে এতদিন দেখে এসেছে, তার নিত্যদেখা সেই পৃথিবী যেন এ-পৃথিবী নয়। তার রূপ গেছে বদলে। কোকিলের ডাক সে তো অনেক শুনেছে, কিন্তু এমন ব্যাকুল আহ্বান সে কখনও শোনেনি।

শীলার আনন্দও যেমন হচ্ছে, আবার ভয়ও তেমনি। যে-মানুষটির সঙ্গে চলেছে সে এখনও তার অপরিচিত। তার মুখের চেহারা দেখেছে, কিন্তু মনের চেহারা দেখেনি।

চন্দন হঠাৎ বলে উঠলো, যার সঙ্গে তুমি জাহাজে এলে, তিনি তোমার কে ?

শীলা বললে, আমার ভগ্নিপতি।

—বোন কোথায় ?

—বোন নয়, দিদি।

—তিনি সঙ্গে এলেন না ?

শীলার মনে পড়লো তার দিদিকে। বললে, দিদি মারা গেছে।

চন্দন বললে, ও। তুমি তাহ'লে ওঁর শালী! তাই বুঝি—

সেই এক প্রশ্ন। কি কথা সে বলবে শীলা বুঝতে পারলে। তাই তার কথাটা শেষ হবার আগেই দৃঢ়কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ।

চন্দন কি বুঝলে জানিনা। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আর তুললে না। হাসতে হাসতে বললে, আন্দামান সম্বন্ধে যেরকম লেক্‌চার দিচ্ছিলেন, তুমিও পালিয়ে গেলে বুঝি সেই জন্যেই? আমিও পালিয়ে গেলাম। উনি কি আবার বিয়ে করেছেন ?

শীলা বললে, না।

চন্দন ড্রাইভারকে বললে, দাঁড়াও।

গাড়ী দাঁড়ালো।

কারবাইন্‌স্‌ কোভ এসে গেছে।

শীলাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে চন্দন নেমে গেল। রাস্তার ধারে ছোট্ট একটি ঘরে আলো জ্বলছিল। সেইখানে কার সঙ্গে কি যেন কথা বললে। তারপর গাড়ীর কাছে এসে শীলাকে বললে, নামো।

ভয়-ভয় করছিল শীলার। জনমানবহীন নিস্তব্ধ সমুদ্রতীর। আকাশে ছোট্ট একখানি চাঁদ উঠেছে। সাদা সাদা মেঘে-ভরা আকাশ। সেখানে মেঘে আর চাঁদে চলেছে লুকোচুরি খেলা। তারই আলোয় পথ দেখে চন্দনের সঙ্গে এগিয়ে চললো শীলা।

সমুদ্রের দিকে খানিকটা গিয়ে শীলা বললে, থাক্ আর গিয়ে কাজ নেই! চলুন বাড়ী ফিরে যাই।

—ভয় করছে ?

শীলার একখানা হাত ধরে চন্দন বললে, কোনও ভয় নেই। এসো।

শ্রেণীবদ্ধ নারকেলের গাছ। নীচে পরিচ্ছন্ন ফুলের বাগান। তারই মাঝখান দিয়ে পথ। সমুদ্রের ঠিক তীরের ওপর উঁচু মঞ্চের মত একখানি ঘর। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

সেইখানে উঠে গিয়ে চন্দন বললে, সমুদ্রে স্নান যারা করে তাদেরই জন্যে এই কারবাইনস্ কোভ্। স্নান যারা করে না তারা এইখানে বসে বসে দেখে।

বড় বড় সিমেণ্ট কংক্রিটের বসবার বেঞ্চি। তারই একপাশে শীলাকে বসিয়ে দিয়ে চন্দন বললে, ছ্যাখো একবার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। চাঁদের আলো ঢেউ-এর ওপর পড়ে কি সুন্দর দেখাচ্ছে ছ্যাখো।

শীলা কোনও কথা বলছে না।

চন্দন বললে, আর ওই যে দেখছো ছোট্ট একটি দ্বীপ, ওর নাম স্নেক্ আইল্যাণ্ড্।

শীলা চম্‌কে উঠলো। বললে, ওই দ্বীপের অধিবাসীরা এখানে বেড়াতে আসে না তো ?

চন্দন হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললে, না-না। সাপকে তুমি খুব ভয় কর বুঝি ?

শীলা বললে, খুব।

চন্দন এতক্ষণ শীলার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এইবার বসতে গিয়ে হঠাৎ তার প্যাণ্টের পকেট থেকে বের করলে এক তাড়া একশ' টাকার নোট। সেইগুলো শীলার সামনে বাড়িয়ে ধরে বললে, ছ্যাখো আমি কিরকম অন্যায় করেছি ছ্যাখো। এই তিন হাজার টাকার নোট কাল নিয়ে এলাম ব্যাঙ্কে জমা দেবো বলে। দেওয়া যখন হলো না, ভাবলাম এগুলো পকেটে পকেটে নিয়ে ঘুরবো না, তোমার কাছে রেখে যাই। কিন্তু তোমার জামাইবাবু আর ওই কুৎসিতম্ এমন চেপে বসলো যে নোটগুলো দেওয়া দূরে থাক্, তোমার সঙ্গে ভাল করে দুটো কথাই বলতে

পারলাম না। বেরিয়ে পড়লাম। আবার আজ সারাটা দিন শুধুই ভেবেছি তোমার এই সুন্দর মুখখানির কথা। এখন দেখছি নোট-গুলো পকেটেই রয়েছে। নাও রাখো তোমার কাছে।

এই বলে তিনহাজার টাকার নোটের তাড়াটা চন্দন তার কোলের ওপর ফেলে দিলে। শীলা সেগুলো সরিয়ে দিয়ে বললে, না।

—না কেন?

শীলা জবাব দিলে না।

চন্দন এইবার বসলো তার গা ঘেঁষে, হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, চুপ করে রইলে কেন, বল!

—কি বলব?

—আমার টাকায় তোমার অধিকার নেই?

—না। অধিকার মুখের কথায় হয় না, অধিকার অর্জন করতে হয়।

—কেমন করে অর্জন করতে হয়?

—ভালোবেসে।

—তাহ'লে তুমি আমাকে ভালবাসো না?

কথাটা শীলা বলতে কিছুতেই চাচ্ছিল না। চন্দন তাকে না বলিয়ে ছাড়লে না।

শীলা বললে, ভালবাসবার চেষ্টা করছি।

চন্দন বললে, তোমার চোখে মুখে যে-জিনিসটা আমি দেখেছি সেটা তাহ'লে কী?

শীলা বললে, ভাল লাগা।

চন্দন বললে, রাখো তোমার ও-সব বই-এ পড়া কথা। আমি বিশ্বাস করি না। ভাল লাগা আর ভালবাসা এক।

এই বলে এক হাত তার গলায় জড়িয়ে আর এক হাত দিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরে নিজের ঠোঁট দুটো শীলার দুই ঠোঁটের ওপর জোর করে চেপে ধরলে চন্দন।

ব্যাপারটা এমন অতর্কিতে হয়ে গেল যে শীলা তার জন্যে প্রস্তুতও ছিল না, চেষ্টা করেও চন্দনের মুখটাকে সে সরাতেও পারলে না।

কিছুক্ষণ পরে চন্দন নিজেই তার মুখটাকে সরিয়ে নিয়ে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, রাগ করলে ?

শীলা বললে, হ্যাঁ করলাম। এতে কী আনন্দ হলো ?

চন্দন বললে, সেকথা তুমি বুঝবে না। একে ডাকাতিই বল আর যাই বল, কিছুতেই আমি সাম্‌লাতে পারলাম না।

শীলা বললে, মানুষ হলে পারতেন !

এই বলে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে।

চন্দন কিছুতেই তাকে উঠতে দিলে না।—বা-রে, আমি বুঝি শুধু এই জন্যেই তোমাকে এত দূরে এই নির্জন জায়গায় টেনে এনেছি ?

খুব বাড়াবাড়ি স্নুরু করলে চন্দন। শীলা অত্যন্ত বিপদে পড়ে গেল। এ বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবার কেউ নেই। ছি ছি, অত্যন্ত অন্যায় করেছে সে এখানে এসে ! এমন সুন্দর এই মানুষটির মধ্যে রুচি বা সংযমের বিন্দুমাত্র বালাই নেই। শীলা তার মনে মনে যে স্বর্গ রচনা করেছিল, বীভৎস ক্ষুধার এই নিরাভরণ কদর্য্যতার মধ্যে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিতে লাগলো শীলা। আজ যদি এই নিতান্ত অপরিচিত অর্বাচীন যুবকের তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষার আগুনে নিজেকে আহুতি দিতে হয় তো সুমুখে ওই অতলস্পর্শী জলধির কোলে আত্মবিসর্জন দেওয়া ছাড়া তার আর মুক্তির কোনও পথই থাকবে না।

গায়ের জোরে যখন কোনও কাজই হলো না, শীলা তখন নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলে। বললে, এ কী করছ চন্দন, আজ আমি বড় ক্লান্ত।

—সমস্ত ক্লান্তি তোমার দূর হয়ে যাবে শীলা, তুমি আমার কথা শোনো।

শীলা বললে, তুমি এতই নিষ্ঠুর ?

—হ্যাঁ আমি এতই নিষ্ঠুর।

শীলা বললে, তাহ'লে তুমি একটুখানি অপেক্ষা কর, আমি চট করে নীচে থেকে ফিরে আসছি।

এই বলে শীলা তার অসম্বৃত বেশবাস একটু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা চন্দনের ছিল না, কিন্তু যে প্রয়োজনের ইঙ্গিত সে করলে, ছেড়ে না দিয়ে তার উপায় ছিল না। বললে, বেশি দূরে যাবার দরকার নেই।

শীলা নীচে নেমে গেল।

ওপর থেকে নীচেটা ভাল দেখাও যায় না, তার ওপর কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল আকাশের চাঁদ।

নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করছিল চন্দন।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল—শীলা ফিরে আসছে না দেখে চন্দন উঠে দাঁড়ালো। ডাকলে, শীলা !

কোনও সাড়া পেলে না।

আবার ডাকলে, শীলা ! কোথায় গেলে তুমি ?

কোনও সাড়া নেই !

অচম্‌কা যেন ঘুম ভেঙ্গে গেল চন্দনের। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির সর্ব্বনাশা মাদকতায় এতক্ষণ তার মস্তিষ্ক, তার জগৎ-সংসার, তার বিচার বুদ্ধি—সব-কিছু আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে ছিল ; শীলার জবাব না পেয়ে হঠাৎ যেন সেই স্বপ্নজালের অবরণ ছিঁড়ে গেল।

তবে কি শীলা তাকে প্রতারণা করলে ?

তিন হাজার টাকার নোটের তাড়াটা পড়েছিল সেইখানে। সেটা সে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

—শীলা ! শীলা !

কোথায় শীলা ?

চন্দন ছুটলো গাড়ীর কাছে। ড্রাইভার গাড়ীর একটা দরজা খুলে দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে, চলুন।

তাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। চন্দন ছুটলো মালির কাছে। জিজ্ঞাসা করলে, যে-মেয়েটি আমার সঙ্গে এসেছিল তাকে দেখেছ ?

মালি কিছু বলবার আগেই মালির দশ বারো বছরের মেয়েটি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বললে, সে তো এই দিকে ছুটে চলে গেল।

আঙুল বাড়িয়ে যে-দিকটা সে দেখিয়ে দিলে, সেই দিক দিয়েই তারা এসেছে। যেতে হলে ওই পথ ধরেই তাকে যেতে হবে।

কিন্তু একা ওই এতখানা পথ রাত্রির অন্ধকারে সে যাবে কেমন করে ?

চন্দন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। বললে, চলো।

ড্রাইভার গাড়ী ছাড়ছে না দেখে চন্দন আবার বললে, দেরি করছ কেন ? চল।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এলেন না ?

চন্দন বললে, সেই তাকেই ধরতে হবে। হেঁটে হেঁটে আগে চলে গেছে এই পথ ধরে।

ড্রাইভার মুখ টিপে একটুখানি হাসলে। সে হাসি চন্দন দেখতে পেলে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সারাটা পথের মধ্যে কোথাও শীলার সঙ্গে দেখা হলো না চন্দনের।

গাড়ী গিয়ে দাঁড়ালো শীলাদের বাংলোর গেটের সামনে। শীলা নিশ্চয়ই এখনও এসে পৌঁছোয় নি।

চন্দন কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। আবার ফিরে যাবে কারবাইন্‌স্‌ কোভে ?

চন্দনকে ইতস্তত করতে দেখে ড্রাইভার বললে, টাকাটা দিয়ে

আমাকে ছেড়ে দিন বাবু। ব্যাপারটা আপনি খুব ভাল করলেন না। আমি পালাই। আপনিও পালান।

চন্দন জিজ্ঞাসা করলে, কেন ? পালাব কেন ?

ড্রাইভার বললে, আমার এক বন্ধু ট্যাক্সি ড্রাইভার একদিন কী বিপদে পড়েছিল শুনুন তাহলে। সেও এমনি একদিন এক আঁধার রাত্রে একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে গাড়ীতে তুলেছিল এবার্ডিন বাজার থেকে। এখান-ওখান এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাড়ীটাকে তারা নিয়ে গেল রাধাকেষ্টর মন্দিরের কাছে। মন্দির তখনও হয়নি। জায়গাটা ছিল ফাঁকা। আপনারাও যেমন নেমে গেলেন, তারাও তেমনি নেমে গিয়েছিল গাড়ী দাঁড় করিয়ে। বলেছিল, একটু দাঁড়াও, আমরা ফিরে আসছি। ফিরে এলো ছেলেটি একা। মেয়েটি এলো না। পরের দিন সকাল বেলা হৈ হৈ কাণ্ড। খবর পেয়ে সবাই ছুটতে লাগল মন্দিরের দিকে। গিয়ে দেখলে, সমুদ্রের ধারে মেয়েটি মরে পড়ে আছে। আমার বন্ধু ড্রাইভার নিজে গেল সেখানে গাড়ী নিয়ে। নিজের চোখে দেখলে মেয়েটিকে। ভয়ে সে তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ছুটলো ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। বললে, হুজুর, কে ওকে মেরেছে আমি জানি। আমি ধরিয়ে দেবো তাকে। ছেলেটি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো। জেল হয়ে গেল তার। ড্রাইভারের কিছু হলো না।

চন্দনের বুকের ভেতরটা ঠক্ ঠক্ করতে লাগল। পকেট থেকে টাকা বের করে ড্রাইভারকে দিতে যাবে, এমন সময় সুন্দরমের মোটর-বাইক এসে দাঁড়ালো তাদের গাড়ীর কাছে।

—কই, শীলা এলেন ?

সুন্দরম গাড়ীর ভেতর উঁকি মেরে দেখলে চন্দন একা বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলে, উনি কি আপনার সঙ্গে গিয়েছিলেন ?

ড্রাইভারের গল্পটা শুনে তার এমনি ভয় ধরেছিল যে ফট করে বলে বসলো, না। আমিও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সুন্দরম বললে, হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়েছেন পাঁচটার সময়।

চন্দন বললে, ওখান থেকে শুনলাম কারবাইন্‌স্ কোভের দিকে গেছে। আপনি একবার সোজা সেইখানে চলে যান। আমি বরং এইদিকটা দেখি।

সুন্দরম আর কোনও কথা বললে না। সোজা কারবাইন্‌স্ কোভের দিকে বাইক চালিয়ে দিলে।

ড্রাইভারকে খুশী করবার জন্য তার প্রাপ্যের অতিরিক্ত তার হাতে গুঁজে দিয়ে সেইখানেই গাড়ীটাকে ছেড়ে দিলে চন্দন। তারপর গাছের আড়ালে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় চলে গেল কে জানে?

আকাশের চাঁদ গেছে ডুবে। সারা পথটা অন্ধকার। একদিকে উপসাগরের কালো জল, আর একদিকে ছোট ছোট টিলার ওপর নারকেলের গাছ। গাছে গাছে জোনাকীর ঝিকিমিকি ছাড়া আর কিছুই ভাল নজরে পড়ছে না।

সাপের মত আঁকাবাঁকা পথ, আর সেই পথের অন্ধকার ভেদ করে ছুটেছে মোটর-বাইকের তীব্র আলো। উপকূলের ভয়াবহ নিস্তব্ধতার মাঝখান দিয়ে সুন্দরমের বাইক যেন হাহাকার করে ছুটে চলেছে শীলার সন্ধানে।

কারবাইন্‌স্ কোভের গেটের সামনে গিয়ে গাড়ী থামলো।

সুন্দরম চীৎকার করে ডাকলে, শী-লা!

সাগরের জলে আর সুমুখের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো সে ডাক।

আর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে এলো নারীকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত আনন্দের উল্লাস।

সুন্দরম সেইদিকে মুখ ফেরালে।

পথের ধারে মালির ছোট্ট একখানি বাড়ী।

সেই বাড়ীর ভেতর থেকে খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে

এলো শীলা আর মালির মেয়ে তুলারী।

শীলা প্রথমেই এসে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কেমন করে জানলে আমি এখানে আছি তাই বল।

সুন্দরম বললে, সেই যে সেই কাল যাকে বিশু ভেবেছিলাম, সেই যে সি-পির বিজনেস্—

—বুঝেছি। সে কি বললে ?

—সেও তো একখানা ট্যাক্সি নিয়ে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাঁসপাতালে গিয়েছিল, সেখানে শুনেছে তুমি নাকি কার সঙ্গে করবাইন্‌স্ কোভে চলে গেছ।

শীলা বললে, তাই না শুনে তুমি এখানে ছুটে এলে। এই তো ?

সুন্দরম বললে, হাঁ বহিন্।

—বাস্ বাস্ বাস্, আজ তুমি আমাকে বহিন্ বলেছ। শীলা বললে, মনে থাকে যেন আমি তোমার বোন, তুমি আমার ভাই।

সুন্দরম বললে, মনে থাকবে মানে ? এই কথাই তো আমি ভাবি। আই এ্যাম্ সান্ অভ্ এ জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান। আমি ভদ্রলোকের ছেলে।

শীলা বললে, ভদ্রলোককেই আজ আমার সব চেয়ে বেশি ভয়।

বলেই সে তাকে মালির বাড়ীতে একবার নিয়ে যেতে চাইলে। বললে, এসো তোমাকে আজ একটি মানুষ দেখাই—যাকে তোমরা ছোটলোক বল। আন্দামানের একজন পুরণো কয়েদীর ছেলের ছেলে। লেখাপড়া শেখেনি, তাই ভদ্রলোক হতে পারেনি। এই তুলারী, তোর বাবাকে একবার ডাক না ভাই !

তুলারী ছুটে গিয়ে তার বাবাকে ডেকে আনলে। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ। যেমন শক্ত দেহ, তেমনি শক্ত মন।

শীলা বললে, বাবা, আমার লোক এসে গেছে, আমি চললাম।

তুলারীর বাবা সুন্দরমের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর বললে, ইনি তো বাঙ্গালী নন্।

সুন্দরম বললে, না আমি মাদ্রাজী।

শীলা বললে, ও আমাকে 'বহিন' বলেছে।

দুলারীর বাবা একটু হাসলে। বললে, মুখ আর মন এক হয় না মা, এই যা দুঃখু।

এই বলে সুন্দরমের দিকে আর-একবার তাকিয়ে সে বললে, নিয়ে যান। দু' দুটো ট্রাক পেয়েছিলাম, নিয়েও যেতে চেয়েছিল, আমিই যেতে দিইনি। কাল আমি হাঁসপাতালে যাব, মায়ের হাসিমুখ যদি দেখতে না পাই, আপনাকেও মেরামত করে দিয়ে আসব। শুনলেন তো আমরা কয়েদীর বংশ, মানুষ খুব খারাপ।

দুলারীকে জড়িয়ে ধরে শীলা দাঁড়িয়েছিল পাশেই।

দুলারী বললে, দিদি, আমি যাব তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

বলতে বলতে চোখদুটো তার জলে ভরে এলো। কিন্তু আবছা অন্ধকারে সে জল কেউ দেখতে পেলে না।

শীলা বললে, যাস্।

মাত্র ঘণ্টাখানেকের পরিচয়। কিংবা তার চেয়েও কম।

দুলারী রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। সুন্দরমের বাইকের পেছনে চড়ে বসলো শীলা। ভট্ ভট্ শব্দ করে গাড়ী ছেড়ে দিলে। শীলা তাকিয়ে দেখলে দুলারীর বাবা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে কাকে যেন প্রণাম করছে।

পেছনের অন্ধকারে সব কিছু মিলিয়ে গেল, শুধু করবাইন্স্ কোভের গেটের সুমুখে দুলারীর বাবার সেই প্রণাম করার ছবিটি শীলার মন থেকে মুছলো না।

সুমুখে সূচিভেদ্য অন্ধকার। কাকে প্রণাম করল সে? তার ভগবানকে? কে তার ভগবান?

শীলাও আজ তার ভগবানকে ডেকেছিল। তার বিপদের মুহূর্তে কোনোদিকেই কোনও পথ যখন সে দেখতে পায়নি তখন একবার ভয়-দুরু-দুরু বক্ষে মনে-মনে বলেছিল' ভগবান রক্ষা কর! মনে-

মনে বলেইছিল শুধু, কিন্তু ওই নামটুকু ছাড়া ভগবানের কোনও ধারণা, কোনও মূর্তি, কোনও অনুভূতিই ছিল না তার মনে। হিন্দুর মেয়ে, দেবদেবীর অনেক মূর্তি সে চোখে দেখেছে। কিন্তু বাড়ীতে তাদের না ছিল কোনও দেবদেবীর ছবি, নাহ'তো কোনও পূজা-পার্ব্বণের অনুষ্ঠান। বরং বাল্যকাল থেকে মূর্তি পূজা সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ কথাই সে শুনে এসেছে। কাজেই কোনও মূর্তির ওপর কোনও আস্থা বা কোনও বিশ্বাসই ছিল না তার। শুধু একটি জিনিস তার মনের মধ্যে দাগ কেটে বসেছিল বহুদিন থেকে। সেটি একটি ক্যালেণ্ডারের ছবি। জামাইবাবু ক্যালেণ্ডারটি এনে বাইরের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। বছরের পর বছর ধরে সে ক্যালেণ্ডারটি টাঙানোই থাকতো, এখনও আছে। জামাইবাবু সেই পুরণো ক্যালেণ্ডারটি কাউকে কোনোদিন সরাতে দেননি। ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণের। মনে হয় যেন জীবন্ত ছবি।

বিপদের মুহূর্তে সেই ছবিটিই যেন দপ করে ভেসে উঠেছিল শীলার চোখের সুমুখে। এ তো মানুষের পরিকল্পিত মূর্তি নয়। এই তো জীবন্ত দেবতা! ত্রাহি মাম্ বলে তাঁরই পায়ে স্মরণ নিয়েছিল সে। বারম্বার শুধু তাঁরই কথা ভেবেছিল।

তাঁরই কথা ভাবতে ভাবতে চোখে জল নিয়ে ছুটে গিয়েছিল মালির কাছে।

চন্দন চলে যাবার পর ঘন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেমন করে বাড়ী ফিরে যাবে। ভেবে ব্যাকুল হয়ে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল।

পরের পর দুটো লরীর ড্রাইভার তাকে পৌঁছে দিতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু দুলারীর বাবা বলেছিল, না। ওদের সঙ্গে তোমাকে পাঠাতে পারব না। ওরা মাতাল।

শীলা তখন কেঁদে ফেলেছিল। চোখের সামনে ছিল শ্রীরাম-কৃষ্ণের সেই ছবি। মনের ব্যাকুলতা আরও বেড়েছিল। ছবিটিও

যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল ঠাকুর যেন হাসছেন। শীলার মনে হয়েছিল—এ সবই তার মনের কল্পনা। তবু—তবু যখন সে শুনেছিল সুন্দরমের মোটর-বাইকের আওয়াজ, শুনেছিল যখন তার ব্যাকুল আহ্বানের প্রতিধ্বনি, তখন সেও না হেসে থাকতে পারেনি। খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছিল সে। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সুন্দরমের কাছে। কিন্তু মনে ছিল নিদারুণ সংশয়। এই ভয়াবহ নির্জন নিস্তব্ধ পথের ওপর দিয়ে সুন্দরমের বাইকের পেছনে, তারই গা ঘেঁষে বসে—কখনও বা তাকে জড়িয়ে ধরে কেমন করেই বা যাবে সে? এই সমস্যার কথাই ভাবছিল শীলা, এমন সময় সুন্দরম নিজেই বলে বসলো—বহিন্।

এ-সবই কি হলো তার প্রার্থনার জন্যই? না, প্রার্থনা না করলেও ঠিক এই রকমটিই হতো?—মোটর-বাইকের পেছনে বসে শীলা এই কথাই ভাবছিল।

সুন্দরম বাইক চালাচ্ছে ভয়ে-ভয়ে। খুব জোর স্পিড তুলতে পারছে না। খানা-ডোবা বাঁচিয়ে খুব সাবধানে চলতে চলতে হঠাৎ একটা বাঁকের মাথায় এসে সুন্দরম ডাকলে, শীলা।

শীলা বললে, উঁ!

—কেমন লাগছে?

—ভাল।

—স্পিড বাড়াবো?

শীলা ভয়ে ভয়ে বললে না না, পড়ে যাব।

হো হো করে হেসে উঠলো সুন্দরম।

আঁধার রাতের সেই নিস্তব্ধ পথপ্রান্তে বড় অদ্ভুত শোনালো তার সেই হাসি! শীলার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটা কিছুক্ষণের জন্য সে ভুলেছিল, আবার চট্ করে মনে পড়ে গেল। আবার ভয়ে ভয়ে প্রার্থনা করলে।

সুন্দরম বললে, ব্যালান্স রাখতে পারলে পড়বে না। এতক্ষণ তো বেশ ব্যালান্স রাখছিলে, এখন আবার ভয় পাচ্ছ কেন?

শীলা চুপ করে রইলো।

—আমাকে জড়িয়ে ধর আর নয়ত' কাঁধে হাত রাখো।

খানায় পড়ে বাইকটা হঠাৎ টাল খেয়ে লাফিয়ে উঠলো।

ভয়ে ভয়ে শীলা সুন্দরমের কাঁধে হাত দিলে।

প্রাণের ভয়ে অজান্তে বেশ চেপেই ধরেছিল শীলা। আর সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরম বোধকরি একটুখানি মজা দেখবার জন্যে গাড়ীর স্পিড দিয়েছিল আরও একটুখানি বাড়িয়ে।

শীলা মুখে কিছুই বলেনি। চোখের সুমুখে আবার ভেসে উঠেছিল রামকৃষ্ণদেবের সেই ছবিখানা। সুন্দরমের মনের কথা বুঝতে না পেরে আবার সে তার ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল— 'তীরে এসে তরী যেন না ডোবে!'

সুন্দরম কিন্তু হাসতে হাসতে আবার ডেকেছিল, শীলা!

শীলা অবশ্য সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু মোটর-বাইকের বিকট আওয়াজ ছাপিয়ে সে সাড়া সুন্দরমের কানে গিয়ে পৌঁছোয় নি।

সুন্দরম এবার খুব চেঁচিয়ে ডেকে উঠলো, শীলা-বহিন্!

শীলাও জোরে বললে, কি বলছো?

—তুমি এখনও আমাকে ঠিক ভাই ভাবতে পারছো না শীলা। তোমার হাত দুটো কাঁপছে।

এতক্ষণে শীলার মন গিয়ে পড়লো তার হাতের ওপর। সত্যিই কাঁপছে নাকি? তা হবে হয়ত'। বুকটা তো কাঁপছে।

শীলা বললে, না। ওটা তোমার গাড়ীর কাঁপুনি।

সুন্দরম একটুখানি চুপ করে রইলো। তারপর বললে, আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে শীলা। মনে হচ্ছে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিই অমরনাথবাবুর কাছে। গিয়ে বলি—আজ থেকে শীলা আমার বোন। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর শীলা, মরবার দিন

পর্য্যন্ত আমি আমার কথা রাখবো।

হঠাৎ তার গলাটা কেমন যেন ভারি হয়ে এলো। গাড়ীর স্পিড দিলে কমিয়ে। বললে, আমার টাকা আছে, ভেবেছিলাম, সেই টাকা দিয়ে সব অভাব আমার ঘুচিয়ে দেবো। কিন্তু একটা অভাব আমার ঘুচলো না কিছুতেই। কেউ আমাকে এতটুকু ভালবাসলে না। ভালবাসতে পারলে না বোধ হয় আমার এই ভূতের মতন চেহারাটাকে।

বলেই সে আপনমনেই একটু হাসলে। সে বড় দুঃখের হাসি। শীলা পেছনে বসেছিল, হাসিটা সে চোখে দেখতে পেলে না কিন্তু বুঝতে পারলে— সে হাসছে। শুধু বুঝতে পারলে না—গাড়ীটা হঠাৎ থেমে গেল কেন?

কি যেন বলতে যাচ্ছিল শীলা। তার আগেই সুন্দরম বললে, চোখে কি একটা যেন পড়লো। বলেই সে তার বুকের পকেট থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে চোখদুটো মুছে নিলে।

গাড়ী আবার চলতে লাগলো।

শীলা বুঝতে পারলে, কিছুই পড়েনি তার চোখে। শুধু ভালবাসার কথা বলতে গিয়ে অশ্রুজলে ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছিল তার চোখের দৃষ্টি। পথের ধারে গাড়ি থামিয়ে সে জল তাকে মুছে ফেলতে হলো।

নির্বিঘ্নে গাড়ী এসে দাঁড়ালো বাড়ীর দরজায়। সুন্দরম ভুলেও একবার জিজ্ঞাসা করলে না—কে তাকে নিয়ে গিয়েছিল কারবাইন্স্ কোভে।

না সুন্দরম, না অমরনাথ।

ধ্যানমৌন অমরনাথ হোমিওপ্যাথি বই নিয়ে বসেছিলেন তাঁর নিজের ঘরে। সুন্দরম বললে, শীলাকে নিয়ে এলাম আমার গাড়ীর পেছনে বসিয়ে।

অমরনাথ কোন প্রশ্নই করলেন না। মুখ তুলে তাকিয়ে একবার

দেখলেন শুধু।

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে কাপড়জামা ছেড়ে শীলা যখন এসে ঢুকলো অমরনাথের ঘরে, ভেবেছিল কোথায় সে গিয়েছিল সেই কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু সেকথা জিজ্ঞাসা না করে হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, ক্ষিদে পেয়েছে ?

তেমনি হাসতে হাসতে শীলা জবাব দিলে, ক্ষিদে তেষ্টা সব জয় করে ফেলেছি।

—সে সব তো জয় করেছিল উমা। যৌবনে যোগিনী সেজেছিল মহাদেবকে পাবার জন্যে।

শীলা বললে, আমার তপস্যা কিন্তু আরও কঠিন।

—কেন ?

শীলা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। বললে, মহাদেবের বাহন ষাঁড়টিকে আমি মহাদেব বলে ভুল করেছিলাম।

অমরনাথ বললেন, ভুলের মাশুল দিয়ে এলে তো ?

—না। ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন।

কথাটা বলবামাত্র আবার সেই শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তিটি তার চোখের সমুখে ভেসে উঠলো। শীলা চোখ বুজে মনে মনেই তাঁকে প্রণাম করে তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালে। নিরাপদে সে বাড়ী এসে পৌঁছেছে।

অমরনাথ তাকে আর ঘাঁটালে না। শুধু বললে, জায়গাটা অচেনা। একটু সাবধানে থেকো।

সুন্দরম এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এইবার সে কথা বললে।

—কোনও ভয় নেই। আমি আছি।

অমরনাথ বললেন, তুমি কি সব সময় ওকে আগলে রাখতে পারবে ?

—নিশ্চয়ই পারবো। শীলা আমার বোন আছে। বোনকে আগলাতে পারব না ?

যেরকমভাবে কথাটা বললে সুন্দরম, মনে হলো যেন তাদের এই নতুন সম্বন্ধের কথাটা সগর্ব্বে প্রচার করাটাই তার উদ্দেশ্য।

অমরনাথ একটু হাসলেন। হেসে তাকালেন শীলার মুখের দিকে। শীলা তন্ময় হয়ে তখনও কি যেন ভাবছে।

অমরনাথ বললেন, তোমার এই নতুন পাতানো দাদাটির একটি বিয়ে দিয়ে দাও শীলা।

শীলা বললে, কেমন করে দেবো? মেয়ে কোথায়?

সুন্দরম হেসে কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলে। বললে, উনি ঠাট্টা করছেন বুঝতে পারছো না?

—না না ঠাট্টা নয়। কালকেই বলতাম, বলবার সময় পাইনি।

সুন্দরম বললে, আজ্ঞে না। বিয়ে আমি করব না। কোনও মেয়ে আমাকে ভালবাসবে না—আমি জানি।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, কেমন করে জানলে?

সুন্দরম বললে, সে-সব তোমার শুনে কাজ নেই। আমি বলতেও পারব না।

—শুনে কাজ নেই। শোনো! অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি একটি বাঙ্গালী মেয়েকে বিয়ে করবে?

সুন্দরম বললে, তার চেয়ে সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করবেন সে আমাকে বিয়ে করবে কি না!

শীলা বললে, ওর কী যে ধারণা হয়েছে—ওর ওই গায়ের রং আর চেহারা দেখে মেয়েরা ওর কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

অমরনাথ বললেন, ছাখো সুন্দরম, মানুষ মানুষের দিকে আকৃষ্ট হয় কিসে জানো? চেহারায় নয়, চরিত্রে।

—যাক্ ও-সব বড় বড় কথা আমার অনেক জানা আছে।

এই বলে সুন্দরম্ উঠে দাঁড়ালো। গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে বললে, শীলা-বহিন্ ছাখোতো পরেশ এখনও আমাদের খাবার দিচ্ছে না কেন?

শীলা হেসে উঠলো। বললে, তুমি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চাচ্ছ, এই তো? বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।

শীলাকে সরাতেই সে চেয়েছিল। শীলা চলে যেতেই সুন্দরম বললে, মানুষ আকৃষ্ট হয় চরিত্রে, আর মেয়েমানুষ আকৃষ্ট হয় টাকায়।

অমরনাথ সোজা সুন্দরমের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, এই বুঝি তোমার ধারণা?

সুন্দরম বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলেই সে যেন অস্থির হয়ে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ঘরের ভেতর।

অমরনাথ বললেন, তোমার তো অনেক টাকা। তাহ'লে তুমি দুঃখু করছো কেন?

—দুঃখু করছি এই জন্যে যে তারা তো আমাকে ভালবাসবে না! তারা ভালবাসবে আমার টাকাকে। আমাকে নয়। তাতে আমার লাভ কি বলুন?

অমরনাথ তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন—এক শ্রেণীর মেয়ে সব সমাজে সব সময়েই জন্মায়—যারা বিলাসিনী। জীবনটাকে তারা ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু তারাই তো সব নয় সুন্দরম। তাদের দিয়ে সবাইকে বিচার কোরো না।

সুন্দরমের কিন্তু বদ্ধমূল ধারণা—সব মেয়েই সমান। সবাই চায় টাকা। সবাই চায় ঐশ্বর্য্য।

অমরনাথ বললেন, ভুল বলছো তুমি সুন্দরম। টাকা নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, মেয়েরা চায় সন্তান। মেয়েরা চায় মা হ'তে। এইটিই তাদের একমাত্র কামনা। তুমি তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়েও একটি মেয়েকে সুখী করতে পারবে না। কিন্তু মনের মত একটি সন্তান যদি দিতে পার, দেখবে তুমি দরিদ্র হলেও সে সুখে থাকবে।

পায়চারি করতে করতে সুন্দরম অমরনাথের মুখোমুখি এসে

থম্‌কে দাঁড়ালো। টেবিলের ওপর হাত রেখে বললে, শুধু সন্তান। ভালবাসার কোনও দাম নেই বলতে চান?

কথাটা সে এমন চীৎকার করে বললে, মনে হ'লো যেন সে আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

বেচারা সুন্দরম!

যুবতী নারীর একটুখানি ভালবাসার কাঙ্গাল সে। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই যুবকের মনের বিদ্রোহ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অমরনাথ বললেন, মানুষ তো জানোয়ার নয় সুন্দরম। জানোয়ার যদি হতো, তাহ'লে নারীদেহকে সে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেই নিশ্চিন্ত হতে পারতো।

এমন সময় শীলা এসে দাঁড়ালো। বললে, খুব হয়েছে মশাই, থামুন। সেই এককথা আর কতবার বলবে? খাবার দেওয়া হয়েছে, এসো।

পরের দিন শীলা নিজেই গেল মিনতিদির কাছে। হাঁসপাতালের কাজ সেরে হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গিয়ে দেখলে, মিনতি চুল আঁচড়াচ্ছে।

—আমি এসেছি দিদি। না এসে আর থাকতে পারলাম না।

—কাজকর্ম্ম কেমন চলছে?

—কেন, ডাক্তারবাবু বলেননি তোমাকে?

—আমি কি হাঁসপাতালের···

কথাটা শেষ করতে দিলে না শীলা।

মিনতিকে জড়িয়ে ধরে হি হি করে হাসতে লাগল।

—হাসছিস কেন? বোস। চা খাবি?

—নিশ্চয়ই খাব। দাও আমি তোমার চুল বেঁধে দিই।

মিনতির হাত থেকে চিরুণীটা কেড়ে নিবার চেষ্টা করলে শীলা, কিন্তু পারলে না। মিনতি বললে, নারে না আমার এ চুল বাঁধবার

দরকার হয় না। এই ছাখ্।

বলেই সে তার এলো চুল মাথায় কোনোরকমে জড়িয়ে নিয়ে বললে, আয় চা করি।

—কেন, তোমার ঠাকুর-চাকর কি করছে?

মিনতি বললে, চা ওরা কেউ করতে পারে না।

ষ্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে মিনতি কেমন যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো শীলার মুখের দিকে।

—অমন করে তাকিয়ে কি দেখছো দিদি?

—তোকে ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।

বলেই এদিক-ওদিক একবার দেখে নিয়ে গলাটা খাটো করে মিনতি জিজ্ঞাসা করলে, একটা সত্যি কথা বলবি?

—কী?

—তুই কি ভগ্নিপতিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিস এখানে?

শীলা ঠিক এই ভয়ই করেছিল। মিনতি কেন, এই কথা সবাই ভাববে।—কার ভয়ে পালিয়ে আসব, দিদি? আমার দিদি বেঁচে নেই। বাড়ীতে এমন কোনও মানুষ নেই যার ভয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হবে।

মিনতি কি যেন ভাবলে একটুখানি চুপ করে থেকে। তারপর বললে, তোর জামাইবাবুর বয়েস বেশি নয়, তার ওপর তোর এই আগুনের মতন রূপ, জাহাজের কেবিনে চারটে দিন চারটে রাত—

শীলা হেসে উঠলো।—থাক্ আর বলতে হবে না। তুমি চেনো না আমার জামাইবাবুকে, তাই এই সন্দেহ করছ—

—তোর জামাইবাবুকে না চিনতে পারি, কিন্তু মানুষের এই আদি রিপুটিকে তো চিনি।

শীলা বললে, আচ্ছা দিদি, এর জন্যে আমাদের এত লুকোচুরির তো কোনও দরকার নেই। আমার দিদি মরবার আগে এই জামাইবাবুর হাতেই তো আমাকে তুলে দিয়ে গেছে। ধরতে

গেলে একরকম বলেই দিয়ে গেছে—শীলাকে তুমি বিয়ে করো।

মিনতি বললে, তা তোর মতন সুন্দরী মেয়েকে হাতের কাছে পেয়েও বিয়ে সে করছে না কেন? নিশ্চয়ই তোকে মনে-মনেও সন্দেহ করে।

—না দিদি না, তা নয়। সত্যি কথাটা তা'হলে বলব? শুনবে?

—বল্। কিন্তু তোর কোনও কথাই আমি বিশ্বাস করব না?

—কেন দিদি?

মিনতি বললে, তোকে সেদিন একটি মেয়ের কথা বলেছিলাম না? সেই মেয়েটা আমার সব বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে। তারও বয়স ছিল ঠিক তো'রই মতন, রূপও ছিল ঠিক এমনি। তার কথা তোকে আমি বলছি দাঁড়া আগে চা খেয়ে নে। এখন তোর জামাইবাবুর কথা কি বলছিস বল্।

—সে সব অনেক কথা দিদি। থাক্ আর তোমার শুনে কাজ নেই।

মিনতি বললে, বিশ্বাস করবো না বলেছি আর অমনি রাগ হয়ে গেল?

শীলা বললে, এই ত্যাখো, উল্টো বুঝলে তুমি।

—না না উল্টো বুঝিনি। বলবি তো বল্, নইলে বেরো এখান থেকে। দূর হয়ে যা।

কথাটা বলেই মিনতি ফিক্ করে হেসে ফেললে। বললে, ইস্কুলে সারাদিন মেয়ে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে আমার মেজাজটা কিরকম হয়েছে ত্যাখ্। তোকে কী যা-তা বলে ফেললাম।

শীলা বললে, না দিদি না।

বলেই সে মিনতির কোলের ওপর মাথাটা গুঁজে তাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, কেন তুমি আমাকে এত ভালবাসলে তাই বল। আমি যে তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারব না দিদি।

মিনতির কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। চায়ের জল গরম

হয়ে গেছে, টি-পটে চা দিতে হবে। তাই সে ছু'হাত দিয়ে শীলার মুখখানি তুলে ধরে বললে, ন্যাকামি করিস না, ওঠ্। আমাকে চা করতে দে।

কিন্তু হঠাৎ তার চোখে চোখ পড়তেই দেখলে, শীলার ছুটি চোখ জলে টল্ টল্ করছে। মিনতি জোর করে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চা তৈরি করতে করতে বললে, ছিঁচ্কাছুনে মেয়েগুলো আমার ছু'চক্ষের বিষ। আমার বোনটা ঠিক এমনিই ছিল। যার কথা তোকে বলব বলেছিলাম সে আমার বোন।

ছুটি পেয়ালায় চা তৈরি করে একটি পেয়ালা শীলার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মিনতি তাকে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলো। নিভৃতে নির্জনে মুখোমুখি বসে মনের কথা বলবার বড় সুন্দর জায়গা।

চা খেতে খেতে মিনতি তার বোনের কথা বললে প্রথমে। বললে, যে-কোনও পুরুষকে পাগল করে দেবার মত রূপ ছিল আমার বোনের। আমার চেয়ে বছর ছুইয়েকের ছোট। আঠারো বছরে আমার যখন বিয়ে হলো, ওর বয়স তখন ষোলো। অনেক করে আগলে আগলে রেখেছিলাম, কিন্তু আমার বিয়ের পর চলে গেলাম শ্বশুরবাড়ী, বাড়ীতে রইলো ছানিপড়া চোখ নিয়ে প্রায়-অন্ধ আমার বুড়ো বাপ, একটা চাকর, আর ওই আগুনের মতন রূপ নিয়ে আমার বোন প্রণতি। যা ভয় করেছিলাম তাই হলো। বাবার একখানা চিঠি পেয়ে আমাদের ভবানীপুরের ছোট্ট বাসায় এসে দেখি, বাবা মৃত্যুশয্যায় আর তার সেবা করবার জন্যে যার থাকা একান্ত প্রয়োজন সেই পণা বাড়ীতে নেই। প্রণতির ডাক-নাম পণা।

বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম পণা কোথায়?

বাবা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বিশেষ কিছুই বলতে পারলে না। ভজু আমাদের অনেকদিনের

পুরণো চাকর। ভজু বললে, পণা আজ দশদিন হলো বাড়ীতে নেই। বাবুকে বললে, বাবা আমি বোম্বাই কখনও দেখিনি। লিলির দাদা বিলেত যাচ্ছে। যদি বল তো লিলির সঙ্গে গিয়ে বোম্বাইটা দেখে আসি। আমার একটি পয়সাও খরচ হবে না। বাবুর অদরিণী কন্যা, সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন। বললেন, যাও। একটু সাবধানে থেকো।

খেয়ে দেয়ে ছুটলাম লিনিদের বাড়ী।

গিয়ে দেখি—বোম্বাই থেকে তারা দু'দিন আগে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে লিনির সঙ্গে। পুরুষ বন্ধু জুটিয়েছে তিন চারজন। সবাই বড়লোকের ছেলে।

আমাকে যে ওখানে দেখতে পাবে পণা তা ভাবতে পারেনি। গাড়ী থেকে নেমেই দেখলে দোরের কাছে আমি দাঁড়িয়ে। নতুন শাড়ী জামা জুতো, শ্যাম্পু-করা চুল, আর সেই রাজেন্দ্রাণীর মতন রূপ। মনে হলো একটি চড়ে ওর লাল গালটা আরও লাল করে দিই। কিন্তু হাত উঠলো না। মার খাবার বয়স তখন ওর চলে গেছে। বললাম, আয় তুই আমার সঙ্গে। লিনিকে বললাম, কিছু মনে করিসনি ভাই। বাবার খুব অসুখ। লিনি বললে, ওর একটা সুটকেস আছে। বললাম, চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দিস আমাদের বাড়ীতে।

পণাকে অনেক করে বুঝালাম। কিন্তু কে বুঝবে? ওর মুখে সেই এক কথা।—আমার জন্যে তুমি ভেবো না দিদি।

—ভাববো না কি বলছিস রে? তুই যে মেয়েছেলে।

হলুমই-বা মেয়েছেলে!

বলে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে!

বললাম, যে-মেয়ের লজ্জা নেই, ভয় নেই, সে-মেয়ে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ও-দুটোর কোনোটাই তোর নেই।

তার জবাবে পণা আমাকে কি বলেছিল জানিস?

শীলা শুনছিল মন দিয়ে। বললে, কি বলেছিল?

—বলেছিল, তুমি আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। তবু তুমি এমন সেকেলে হলে কেমন করে দিদি?

এমনি লির্লজ্জ আর নির্ভয় হয়ে মডার্ণ হতে চেয়েছিল প্রণতি। তার ফল ফলতে বেশি দেরি হয়নি।

মিনতি তার চিঠিখানি এনে দেখালে শীলাকে।

—"দিদি, তখনি যদি আমি তোমার কথা শুনতাম! একটা কথা আছে—লজ্জাই নারীর ভূষণ। তখন মনে হতো—কথাটা বুঝি সেকেলে মেয়েদের বেলাই খাটে বেশি। কিন্তু তা নয় দিদি। এখন আমি সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। ভেবেছিলাম, বাড়ীখানা মর্টগেজ দিয়ে বাবা তোমার বিয়ে দিলেন। বাবার আর কিছু নেই। আমার বিয়ে বাবা দিতে পারবেন না। আমার বর আমাকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে। লেখাপড়া যদি শিখতাম তা'হলেও নাহয় কোথাও চাকরি-বাকরি করে দিন কাটাতাম। কিন্তু বাবা মারা যাবার পর মনের মত একটি মানুষের আশ্রয় খুঁজতে গিয়েই আমার হলো সর্ব্বনাশ! তোমার বাড়ীতে গিয়ে আমাকে থাকতে বলেছিলে। কিন্তু তখন সেটাকে মনে করেছিলাম অসম্মানজনক। তাই সম্মান-জনক আশ্রয়ের সন্ধানে যাদেরই আমি অবলম্বন করেছি তারা কেউ আমাকে সম্মান দেয়নি, বিশ্বাস করেনি, ভালবাসার অভিনয় করেছে আর আমার দেহটাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে। তোমাকে আর নতুন করে কি বলবো দিদি, সবই তুমি জানো। শুধু জানো না—আমি এখন কেমন আছি। একটি সুন্দর মানুষকে ভালবাসা দিয়ে আর ভালবাসা পেয়ে একটি সুখের নীড় বাঁধবার স্বপ্ন আমার স্বপ্নই রয়ে গেল দিদি। এখন যিনি আমার জীবনের সঙ্গী, তাঁর চোখে আমি পুরণো হয়ে গেছি আর সেই দুঃখে তিনি মদ ধরেছেন। তাঁর সঙ্গে রোজই আমার মন কষাকষি চলছে। খুব সম্ভব এবার তিনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন। তাই ভাবছি তার আগে আমিই তাঁকে পরিত্যাগ করব কিনা।

আমার এক একসময় কি মনে হচ্ছে জানো দিদি? মনে হচ্ছে—মন্টুকে আমি তোমার বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে আসি। ওই মন্টুই হবে আমার শেষ আশ্রয়। মন্টু আমার ভালবাসার সন্তান। মন্টুর বাবার সঙ্গে সেদিন আমার দেখা হয়েছিল। চোখে চোখে দেখা হতেই মনে হলো এখনও সে আমাকে ঠিক তেমনি ভালবাসে। মনে হলো, তার পাদুটো জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাই। মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য নিজের যে সর্ব্বনাশ আমি করেছি, তার যথেষ্ট শাস্তি আমি পেয়ে গেছি। এবার এসো, আমাকে তুমি গ্রহণ করো। কিন্তু তার কাছে যাবার সাহস আমার হলো না। ভাবছি একদিন একখানা চিঠি লিখব। মন্টুর কথা তাকে জানিয়ে দেবো। কিন্তু তোমার অনুমতি ছাড়া কিছুই আমি করতে পারছি না দিদি। কি করবো তুমি আমাকে জানিও।

তোমার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম। আশাকরি তুমি ভালই আছ। ইতি।

তোমার বোন
প্রণতি

চিঠিখানা পড়ে শীলা বললে, শেষটা ভাল বুঝতে পারলাম না দিদি।

মিনতি বললে, বিয়ের আগে ঝড়ের মত যে জীবন ও যাপন করছিল তারই মাঝখানে এই একটি মানুষের সঙ্গে হয়েছিল ওর সত্যিকারের ভালবাসা। আর তারই ফলে এই সন্তান। পণা তাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধবে সব ঠিক, এমন দিনে পণার এক পূর্ব্ব প্রণয়ী দিলে সব গোলমাল করে। সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। পণা কেঁদে এসে পড়লো আমার কাছে। লুকিয়ে রাখলাম পণাকে। ছেলে হলো। ছেলেটিকে আমার নিঃসন্তান বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে পণাকে আমি তাড়িয়ে দিলাম

বাড়ী থেকে। পণা তখন বিয়ে করে বসলো সেই ছেলেটিকে—যে তার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে। তারপর যা ঘটলো সে রকম ঘটনা নাটক নভেলে পড়া যায়। সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না।

শীলা বললে, বল না দিদি, আমি শুনবো।

—সব বলবো। কিন্তু এর জন্যে তোকে কি করতে হবে জানিস ?

—বল কি করতে হবে।

—তোকে আমার এখানে থাকতে হবে। অন্ততঃ একটি মাস। তোর জীবনটাও ঠিক পণার মত হয়ে যাবে তা আমি চাই না।

মিনতি সত্যিই তাকে রেখে দিলে তার কাছে।

অমরনাথ রইলেন সুন্দরমের বাড়ীতে, আর শীলা রইলো ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারে।

প্রথমদিন চাকর দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল অমরনাথের কাছে। অমরনাথ ভেবেছিল বুঝি ত্ব'জনে গল্প করতে করতে রাত্রি হয়ে গেছে, তাই বোধকরি মিনতি তাকে ছেড়ে দেয়নি। দ্বিতীয়দিন কিন্তু মিনতি নিজেই গিয়ে হাজির হলো সুন্দরমের বাংলোয়। শীলা তখনও হাঁসপাতাল থেকে ফেরেনি। অমরনাথ বসে বসে গল্প করছিল সুন্দরমের সঙ্গে।

—এই যে, ভাস্থর, কেমন আছ ?

সুন্দরম বলে উঠলো, ভাল আর আছি কোথায় দিদি ? আপনি আমার বহিনকে ধরে রেখেছেন কাল থেকে। বাড়ী আমার অন্ধকার।

—শীলা বুঝি 'বহিন' হয়েছে তোমার।

জবাবটা দিলেন অমরনাথ। বললেন, সেক্স সাইকোলজি এই

কথাই বলে। যাকে চাই অথচ পাই না, পাবার কোনও আশাই যেখানে থাকে না, মানুষ সেখানে এইরকম একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে। এটা মনের খেলা।

মিনতি মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো আর সুন্দরম তার প্রতিবাদ করে বসলো।—এ কী কথা বলছেন আপনি? ছি!

অমরনাথ আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, ঠিক কথাই বলছি। মনের অগোচরে এই খেলা চলে। মানুষ অনেক সময় বুঝতেও পারে না।

মিনতি বললে, শীলাকে আমি আজ নিয়ে যাচ্ছি আমার বাড়ীতে মাসখানেক রাখব আমার কাছে।

সুন্দরম বললে, আর আমরা?

—তোমরা যেমন আছ তেমনি থাকবে। শীলার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে হয়—যাবে আমার ওখানে।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথাও কিছু গোলমাল দেখলে নাকি!

মিনতি বললে, দেখতেই-বা কতক্ষণ!

বলেই সে অমরনাথকে অনুরোধ করলে পাশের ঘরে যাবার জন্যে।—আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে আপনার সঙ্গে।

সুন্দরম সেদিক দিয়ে অত্যন্ত ভদ্র। বললে, না থাক্, আপনারা কথা বলুন। আমিই উঠে যাচ্ছি।

সুন্দরম উঠে যেতেই মিনতি বললে, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো।

অমরনাথ বললেন, দাদা বলে সত্যিই যদি ডেকে থাকো তো সে অধিকার তোমার আছে।

মিনতি বললে, আচ্ছা দাদা, শীলাকে আপনি বিয়ে করলেন না কেন?

অমরনাথ হেসে বললেন, এই কথা? তা মন্দ বলনি তুমি। ওই রকম একটি সুন্দরী স্ত্রী পেতে কার না ইচ্ছে করে বল? এক একসময় মনে হয়—দিই বিয়ে করে। কিন্তু কাজটা আর হয়ে ওঠে না কিছুতেই!

—কেন? আপত্তিটা কোথায়?

—আপত্তি? অমরনাথ কি যেন ভেবে বললেন, আপত্তি আমার মনে।

মিনতিও কি যেন ভাবছিল। অমরনাথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা মিনতি, তুমি নিজে মেয়ে হয়ে এ কথা কেমন করে বলছো? শীলা কোন দুঃখে তার দিদির স্বামীকে বিয়ে করবে বলতে পার? আমার মত একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড স্বামীর সঙ্গে তার বয়েসের কত তফাৎ হবে একবার ভেবে দেখেছ?

মিনতি একটি কথাও বললে না। মাথা হেঁট করে তখনও কি যেন সে ভাবতে লাগল।

অমরনাথ বললেন, আমি চাই শীলা তার মনের মত একটি ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করুক!

মিনতি এইবার মুখ তুলে চাইলে।

—তাই বুঝি ওকে এই আন্দামান দ্বীপে নিয়ে এলেন?

অমরনাথ বললেন, ঠিক তার উলটো। ও-ই আমাকে এনেছে এখানে। তাহ'লে সত্যি কথাটা শোনো মিনতি। তুমি ডাক্তারের স্ত্রী, তোমাকে বলা যদিও উচিত নয়, তবু বলি। ওর ছোট ভাই এখানে পালিয়ে এসেছে। তাকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে শীলা এসেছে আন্দামানে। চাকরি করবার জন্যে আসেনি।

মিনতি জিজ্ঞাসা করলে, ভাই-এর ঠিকানা আপনি জানেন?

—কিছু জানি না।

এমন সময় শীলা এলো হাঁসপাতাল থেকে।

মিনতি বললে, নে চট্‌পট্‌ জামা-কাপড় ঠিক করে নে। আর দেরি করিসনে।

শীলা অমরনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, অনুমতি নিয়েছ জামাইবাবুর ?

মিনতি বললে, নিয়েছি।

ডাক্তার ভাদুড়ীকে হাঁসপাতালে রোজই দেখছে শীলা, এখন দেখলে বাড়ীতে।

এখানে তাঁর অন্য রূপ। এ যেন অন্য মানুষ।

প্রচুর মদ খেয়ে চুরুট টানতে টানতে বাড়ী ফেরেন টলতে টলতে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসেই ডাকেন, মিতে ! মিতে !

মিনতিকে ডাকেন মিতে বলে'।

মিনতি বলে, এসো। ধরতে হবে নাকি ?

—ধরতে কোনোদিন হয়েছে আমাকে ?

—আজ যেন একটু বেশি খেয়েছ বলে মনে হচ্ছে।

—কখ্‌খনো না। ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে এগিয়ে আসেন। বলেন, তুমি যতটুকু খেতে বলেছ ঠিক ততটুকু খেয়েছি। শীলা কোথায় ?

মিনতি বলে, শীলার সঙ্গে তোমার কী দরকার ?

—বাড়ীতে রয়েছে, তার সঙ্গে দুটো কথা বলবো না ?

গম্ভীর মুখে মিনতি বলে, না।

—ভারি মিষ্টি মেয়ে শীলা। ঠিক পণার মত।

—না, পণার মত নয়। পণার চেয়ে অনেক ভাল।

এই বলে স্নান করবার ঘরের দোরের কাছে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে ছেড়ে দেয় মিনতি।

এমনি প্রত্যহ।

সেদিন অমনি স্নানের ঘরে ডাক্তারকে ঢুকিয়ে দিয়ে মিনতি ডাকলে, শীলা !

শীলা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, জবাব দেবার প্রয়োজন হলো না, মিনতি তার কাছে গিয়ে বললে, দেখছিস তো আমার কেমন ডিউটি ?

শীলা মুখ টিপে একটুখানি হাসলে।

—না হাসি নয়, ছাখ্।

নিভানো ষ্টোভের ওপর নামানো ছিল এক ডিস মুরগীর মাংস, সেইটে তুলে নিয়ে খাবার টেবিলের ওপর নামিয়ে মিনতি শীলাকে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, দেখলে জাল-দেওয়া মিট্-সেফ্টা খুলে ছুরি কাঁটা আর শ্লাইস্-করা রুটি খানকতক নিয়ে সে এগিয়ে আসছে টেবিলের দিকে।

রুটি মাংস সাজিয়ে রেখে সুমুখের চেয়ারটা দেখিয়ে শীলাকে বসতে বললে মিনতি। নিজেও বসলো। বললে, এমনি ঘর-সংসারের কাজ তোকেও একদিন করতে হবে।

—করব। বলে শীলা বসলো।

বসেই একটু হেসে বললে, ডাক্তারবাবুকে এই অভ্যেসটি ছাড়িয়ে দিতে পার না ?

—কোন্ অভ্যেসটি ?

শীলা বললে, এই মদ খাওয়ার অভ্যেসটি।

মিনতি কিছু বলবার আগেই 'শুনেছি' 'শুনেছি' বলতে বলতে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন বাথরুম থেকে।

কোট-প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরেছেন, গায়ে গেঞ্জি,—হাসতে হাসতে ডাক্তারবাবু এসে বসলেন তাঁর চেয়ারে। বললেন, মদ খাওয়ার এই অভ্যেসটি মিতেই তো আমাকে ধরিয়েছে। ছাড়তে বলবে কোন্ মুখে ?

শীলা মিনতির দিকে তাকালো।—হ্যাঁ দিদি, সত্যি ?

মিনতি শীলার কথার জবাব না দিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললে, মাত্রা কি আজ বেশি হয়ে গেছে নাকি ?

—কখ্‌খনো না। ডাক্তারবাবু বললেন, যেরকম তুমি দেখিয়ে দিয়েছ তার এক ফোঁটা বেশি নয়।

ব্যাপারটা শীলা ঠিক বুঝতে পারছিল না। বড় বড় চোখদুটি তুলে তাকাচ্ছিল একবার মিনতির দিকে, একবার ডাক্তারবাবুর দিকে।

ডাক্তারবাবু বললেন, মিতের লজ্জা করছে বলতে। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মিনতি রাগ করে একবার তাকালে ডাক্তারের দিকে। কিন্তু ডাক্তার সে চোখরাঙানির ধারপাশ দিয়েও গেল না। খেতে খেতে বলতে সুরু করলে তার দুঃখের কাহিনী।—মিতে আমাকে কম দুঃখু দেয়নি শীলা। ওকে ভালবেসে সারাজীবন আমি শুধু দুঃখুই পেলাম।

মিনতি বললে, তুমি আমাকে খুব সুখে রেখেছ, না ?

—বেশ, তাহ'লে কাটাকাটি হয়ে গেল। আর কিছু বলব না ?

বলবো না বলেও ডাক্তারবাবু চুপ করে থাকতে পারলেন না। আবার আরম্ভ করলেন কথা বলতে। বললেন, বিয়ের পর আমাদের মতন মানুষের যা হয় তাই হলো। সুন্দরী বৌ পেয়ে একেবারে যেন পাগল হয়ে গেলাম। ঘন ঘন ছুটতে লাগলাম মিতের কাছে। কিন্তু কোথায় মিতে ? মিতে আমার তখন তার বোনকে নিয়ে মশ্‌গুল ! প্রণতির কথা ওকে বলেছ ?

মিনতি বললে, ও সব জানে। তুমি খাও।

ডাক্তার বললে, খাই। কিন্তু প্রণতির কথা ওর জানা দরকার। হাঁসপাতালে যেরকম দেখছি, তাতে শীলারও আর বেশি দেরি নেই।

শীলা বলে উঠলো, কি দেখছেন ?

ডাক্তারবাবু হাসতে লাগলেন। বললেন, ছোঁড়াগুলো সব পাগল হয়ে উঠেছে। তোমাকে পায় যদি তো ছিঁড়ে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

শীলা সে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির রেখা টেনে এনে বললে, অত সস্তা নয়।

শীলার এই মুখভঙ্গী দেখে ডাক্তারবাবু যেন একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, দেখলে দেখলে মিতে, শীলার হাসিটা ঠিক একবারে পণার মত।

মিনতি বললে, আমি দেখেছি। দেখেছি বলেই ওকে আমি নিজের কাছে এনে রেখেছি।

—এই মরেছে! ডাক্তারবাবু একটা হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি কি এবার শীলাকে নিয়ে পড়বে নাকি? বুড়ো বয়েসে তাহ'লে আমার অবস্থা কি হবে? তোমাকে যে কথা বলছিলাম শীলা। এই মদ খাওয়ার কথা। তোমারই মতন সুন্দরী ওর বোন প্রণতি তখন প্রেমের খেলায় হাবুডুবু খাচ্ছে। আর তার ঠ্যালা সামলাচ্ছে ওর দিদি—আমার এই মিতে। আমি বেচারা যাই কোথায়? ছুটে ছুটে আসি মিতের কাছে, কিন্তু মিতেকে পাই না। তখন একদিন পণাকেই জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, "পণা-সুন্দরী, তুমি দু'হাতে আনন্দ বিতরণ করছ পৃথিবীর লোককে, আর তোমার এই ঘরের মানুষ ভগ্নিপতিটি তৃষিত চাতকের মত ছট্‌ফট্‌ করে মরছে। একটুখানি আনন্দ তাকে তুমি দাও, তোমার পুণ্যি হবে।" তখন সে কি করলে জানো? ঠিক তোমারই মত ঠোঁট কুঁচকে একটা মিষ্টি হাসি হেসে বললে, "অত সস্তা নয়।" কাউকে না পেয়ে তখন এই মদ ধরলাম। মিতেকে বলে-কয়ে ওর অনুমতি নিয়েই ধরেছি। বিশ্বাস না হয় তো জিজ্ঞাসা কর ওকে!

মিনতির দিকে তাকালো শীলা।

মিনতি তখন শীলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি

বললে, তখন তোকে বললাম না, বিয়ের আগেই পণা কি সর্ব্বনাশ করে বসেছে। আর ঠিক সেই সময় আমার ওই আস্ত পাগল মানুষটি বলে কিনা—'লেট হার রিপ দি হারভেষ্ট', নিজেই বাধিয়েছে নিজেই বুঝুক্ এর মজাটি। তুমি এখন এসো আমার কাছে মুখে মুখ দিয়ে বসে থাকো।—আচ্ছা তুই-ই বল তো শীলা, আমি পারি সে সময় বোনকে ফেলে দিতে ?

শীলা বললে, তা অবশ্য পারো না, কিন্তু বোনটি তোমার ভাল কাজ করেনি দিদি।

ডাক্তারবাবুর খাওয়া তখনও শেষ হয়নি। কথাটা শুনে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠিক বলেছে শীলা !

মিনতি বললে, তুমি থামো ! সুযোগ পেলে তুমিও ভিক্‌টিম্ হতে পারতে।

ডাক্তারবাবু বললেন, কখ্‌খনো না। আমার মিতে যদি আমার পাশে থাকে তো স্বর্গের উর্ব্বশীও আমাকে টলাতে পারবে না।

স্বামী সৌভাগ্যে মিনতির মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেল। তেমনি হেসেই সে ডাক্তারবাবুকে বললে, খুব হয়েছে আর পাগলামি করতে হবে না।—দ্যাখ্ শীলা, এর জন্যে পণাকে আমি অনেক তিরস্কার করেছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম—ছেলেটিকে সে সত্যিই ভালবেসেছিল, ছেলেটিও তাকে কম ভালবাসেনি, তখন তাদের এই দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা না করে পারিনি।

শীলা বললে, তা'হলে তোমাকেও আমি আমার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলবো দিদি।

শীলা বলেছিল।

বলেছিল সেদিনের সেই 'করবাইন্‌স্ কোভে'র ঘটনার কথা।

চন্দন চ্যাটার্জির মত প্রিয়দর্শন যুবকের দুর্দমনীয় আকর্ষণ, তার নিজের কুমারী জীবনের অনাস্বাদিত আনন্দের উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা,—

সবই ছিল সেখানে ; তবু তাদের প্রথম পরিচয়ের পরম মুহূর্ত্তটিকে কলুষিত করে দেবার মত বিকৃত ক্ষুধা নিয়ে যে অসংযত পশু এসে দাঁড়িয়েছিল সেই অন্ধকার উপসাগরের তীরে, তাকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। শীলা তার হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে জয় করতে চেয়েছিল পরম সুন্দর একটি মানুষের হৃদয়কে। পশুর সন্তানের জননী হতে সে চায়নি।

সব কিছু শুনে শীলার মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মিনতি জিজ্ঞাসা করেছিল, সে ছোঁড়াটা আর আসেনি তোর কাছে ?

শীলা বলেছিল, না।

—তুই কি এখনও তাকে ভালবাসিস ?

—ভাল আমি তাকে বাসলাম কখন দিদি ? সময় কোথায় পেলাম ? সুন্দর চেহারা দেখে পিছু পিছু ছুটেছিলাম শুধু।

মিনতি বলেছিল, ভাল তো লেগেছিল ?

—তা লেগেছিল।

মিনতি বলেছিল, এবার যদি আসে তো আমার কাছে নিয়ে আসিস। আমি একবার দেখব।

—তার সঙ্গে আবার তুমি আমাকে জড়িয়ে ফেলতে চাও ? অনেক তো দেখলে, এখনও তোমার দেখায় সাধ মিটলো না ?

মিনতি হাসতে হাসতে বলেছিল, আমি কি নিজের জন্য দেখতে চাইছি শীলা, আমি দেখতে চাই তোর জন্যে।

একটি মাস দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল। ওদিকে সুন্দরমের সঙ্গে অমরনাথও বেশ আছেন। এদিকে মিনতির সংসার শীলার মনে হচ্ছে যেন নিজের সংসার।

অমরনাথ তিন চারদিন এসে দেখা করে গেছেন শীলার সঙ্গে। বলে গেছেন সুন্দরম তার 'বহেনের, আদেশ শিরোধার্য করে নিয়েছে।

দিবারাত্রি তার মোটরবাইক্ নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে—বিশ্বনাথের সন্ধানে। তার কোন ছবি নেই বলে যা একটু অসুবিধা হচ্ছে।

সুন্দরম দুদিন গিয়েছিল হাঁসপাতালে। বলে এসেছে—এবার সে একদিন যাবে মংলুটনে। জঙ্গলের কাটা বড় বড় গাছের গুঁড়িগুলো যেখানে হাতী দিয়ে সরানো হয়, সুন্দরমকে কে নাকি খবর দিয়েছে—সেইখানে কয়েকজন বাঙ্গালী নাকি নতুন এসে কাজে ঢুকেছে। সুন্দরম সেইখানে একবার বিশ্বনাথের খোঁজ করে আসবে।

শীলা বলেছে, গত জন্মে তুমি নিশ্চয়ই আমার কেউ ছিলে সুন্দরম।

বাস্, শীলার মুখের এই ছোট্ট কথাটি নিয়েই মনের আনন্দে সেদিন চলে গিয়েছিল সুন্দরম।

আবার একদিন এলো ঠিক চারটের সময়।

মোটরবাইকের আওয়াজ শুনে ফিমেল ওয়ার্ডের জানলার পথে মুখ বাড়িয়ে শীলা দেখলে, সুন্দরমের বাইকের পেছনে বসে চন্দন চ্যাটার্জি।

শীলার ইচ্ছে ছিল না বেরিয়ে আসবার, কিন্তু বেরিয়ে তাকে আসতে হলো শেষ পর্যন্ত।

বেরিয়ে এলো শুধু সুন্দরমের জন্যে।

—শীলা-বহেন্, ছ্যাখো কা'কে ধরে এনেছি। আসতে উনি চাইছিলেন না কিছুতেই, কিন্তু আমার নিজের গরজে ধরে আনলাম।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শীলা বললে, গরজটা কিসের শুনি?

—আমার সেই সি-পি বিজনেসের এখনও কোনও কিনারা হলো না, তাই ভাবছি তুমি যদি বল তো কিছু টাকা দিয়ে আমি ওঁর পার্টনার হয়ে যাই।

শীলা বললে. আমি কেন বলতে যাব?

সুন্দরম তাকালে একবার চন্দন চ্যাটার্জির দিকে। গাড়ী থেকে নেমে সে তখন সুমুখের একটা গাছের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

সুন্দরম বললে, পার্টনার যে উনি নিতে চাচ্ছেন না। বলছেন— শীলা যদি বলে তো নিতে পারি।

শীলা বললে. না, আমি বলব না।

কথাটা শুনেই চন্দন মুখ ফেরালে। বললে, শুনলেন তো? আমি জানি উনি বলবেন না।

এই বলে চট্ করে শীলার কাছে এসে দাঁড়ালো চন্দন চ্যাটার্জি। সুন্দরম যাতে শুনতে না পায় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে চাপা গলায় বললে, আপনি নিজেকে খুব চালাক মনে করেন, না?

শীলা বললে, অন্ততঃ বোকা মনে করি না।

—না, বোকা আপনি ন'ন। আপনি অত্যন্ত চতুর। কিন্তু চাতুরী অনেক সময় মানুষকে বিপদে ফেলে দেয় জানেন তো?

শীলা চুপ করে শুনে যেতে লাগলো।

চন্দন আবার বললে, আপনি অত্যন্ত চতুর বলেই পালিয়ে গিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, ও-সব ব্যাপারে আপনার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা কিছু নেই, আপনি একেবারে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কুমারী।

শীলার মুখের চেহারার কোনও পরিবর্ত্তন হচ্ছে কিনা চন্দন সেটা লক্ষ্য করলে। তারপর বললে, সত্যি যদি তাই হতেন, তাহ'লে নিতান্ত অসহায়ের মত লজ্জায় চোখ বুজে পড়ে থাকতেন, আর তখনই বুঝতে পারতেন—আমি আপনাকে একটুখানি পরীক্ষা করে দেখে নিতে চেয়েছিলাম মাত্র। নইলে প্রথম দিনেই আপনার সঙ্গে ওরকম দুর্ব্যবহার করে নিজেকে জানোয়ার প্রতিপন্ন করবার মত বোকা আমি নই। যাক্‌গে, সে সব কথা আপনি আজ বিশ্বাস করতেও পারেন, নাও পারেন। আমার শুধু এইটুকু মাত্র

অনুরোধ—আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। চলি।

বলেই চন্দন পেছন ফিরে দেখলে সুন্দরম একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

শীলা কাজে ফিরে যাবার আগে সুন্দরমকে কি যেন বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু মুখ দিয়ে তার কথা বেরুলো না।

চন্দন সোজা চলে যাচ্ছিল, সুন্দরম তার হাতখানা চেপে ধরে বললে, যাচ্ছেন কোথায়? চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।

এই বলে তাকে গাড়ীর কাছে টেনে এনে শীলার দিকে তাকিয়ে বললে, কাল আমি মংলুটনে যাব। তারপর কি হয় তোমাকে এসে জানাব। আজ চললাম।

বাইকের পেছনের সিটে চড়বার আগে চন্দন একবার শীলার দিকে তাকিয়েছিল। শীলার মনে পড়লো মিনতির কথা। বললে, দেখুন চন্দনবাবু, আমি আজকাল ডাক্তার ভাদুড়ীর কোয়ার্টারে থাকি। আপনি যদি দয়া করে সেখানে একবার আসতে পারেন তো বড় ভালো হয়।

চন্দন বললে, চেষ্টা করব।

দিন চার-পাঁচ পরে একদিন হাঁসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে শীলা ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় মনে হলো পেছনে কে যেন ডাকছে ঃ দিদিমণি!

শীলা থমকে থামলো। তাকাতেই দেখে, বাসুদেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

—চিনতে পারছো দিদিমণি? আন্দামানের কয়েদী আমি সেই বাসুদেব ভট্‌চাজ। সেই যে সেই জাহাজে—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলে না শীলা।

থাক আর বলতে হবে না। আমি একদিন যাব ভেবেছিলাম,

কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি। বৌ-ছেলে ভাল আছে তোমার ?

বাসুদেব বললে, হ্যাঁ দিদিমণি, ভাল আছে। তুমি সময় পাবে না। আমিই বরং একদিন ওদের নিয়ে আসব তোমার কাছে। ডাক্তারবাবু ভাল আছেন ?

শীলা বললে, সব ভাল আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এসেছ এখানে ?

—না দিদিমণি। আমি একটি মেয়েকে ভর্ত্তি করে দিয়ে গেলাম ফিমেল ওয়ার্ডের কুড়ি নম্বর বেডে। নাম সুরবালা। তাকে একটু দেখো।

শীলা জিজ্ঞাসা করল, তোমার নিজের লোক ?

—না দিদিমণি। পুষ্প ছাড়া আমার নিজের কেউ নেই। আমি আবার আসব। আজ চললাম। দোকান ফেলে এসেছি।

বাসুদেব চলে যেতেই কুড়ি নম্বর বেডের কাছে গিয়ে শীলা দেখলে, বর্ষীয়সী এক বিধবা মহিলা বালিসে ঠেস দিয়ে খাটের ওপর বসে আছে। গায়ের রং ফর্সা। মুখে কমনীয়তার লেশমাত্র নেই তবু দেখলেই মনে হয়—বাঙ্গালী।

শীলা চার্ট দেখলে, মেয়েটি ব্রাহ্মণের মেয়ে। নাম সুরবালা। জ্বরজ্বালা কিছু নয়। ডান পায়ের হাঁটুর কাছটা ফুলে আছে। চলাফেরা করতে পারে না। অসহ্য যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কাতর হয়ে পড়ে। হাসপাতালে এসেছে চিকিৎসার জন্যে।

শীলা মন দিয়ে চার্টটা পড়ছে দেখে সুরবালা হাত বাড়িয়ে শীলার হাত চেপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে এলো তার নিজের কাছে। কাঠের মত শক্ত হাত। সাদা চামড়ার নীচে বড় বড় নীল শিরাগুলো স্পষ্ট দেখা যায়।

নার্সের সঙ্গে রুগীর এরকম ব্যবহার যদিও হাঁসপাতালের আইন

সঙ্গত নয়, তবু বয়সের একটা সম্মান আছে। শীলা চুপচাপ তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছেন!

স্নুরবালা বললে, তাড়াতাড়ি ভাল করে দাও মা, যন্ত্রণায় মরে গেলাম।

—আমরা তো ভাল করতে পারি না। ডাক্তারকে বলবেন।

বলেই চলে যাচ্ছিল শীলা। স্নুরবালা বললে, তোমার নাম কি? সময় অসময় যদি ডাকতে হয় তো কি বলে ডাকব?

—আমার নাম শীলা।

—বাঙ্গালী?

শীলা তার মাথাটি কাৎ করে বললে, হ্যাঁ।

—বামুন-কায়েতের মেয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ব্রাহ্মণ। আমরা চক্রবর্তি।

স্নুরবালা বললে, আমিও বামুনের মেয়ে। কলকাতায় বাপের বাড়ী, আর শ্বশুরবাড়ী—এই যমপুরীতে, আন্দামানে।

বলেই ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান হাসলে স্নুরবালা। হেসে একটু চুপি চুপি বললে, কয়েদী। খুন করেছিলুম একটা লোককে। আর একটা লোককে জন্মের মতন—যাক্, সেসব কথা পরে বলব। তারপর বিয়ে করেছিলুম এইখানকার এক কয়েদীকে। সেও ছিল বাঙ্গালী বামুন। ছিল কিনা কে জানে। মুখে বলতো—এই পর্যন্ত জানি। —উঃ! এইবার যন্ত্রণা আরম্ভ হলো।

দাঁতে দাঁত চেপে স্নুরবালা তার হাঁটুতে হাত বুলোতে লাগলো।

শীলা বললে, এই জন্যেই বাস্নুদেবের সঙ্গে আপনার পরিচয়?

যন্ত্রণাকাতর মুখেই স্নুরবালা জিজ্ঞাসা করলে, চেনো নাকি?

শীলা বললে, হ্যাঁ। এক জাহাজে এসেছিলাম কলকাতা থেকে। সে-ই তো আপনার কথা আমাকে বলে গেল।

—মানুষটা ভালো।

কথা বলতে গিয়ে স্নুরবালা বোধ হয় তার যন্ত্রণার কথা একটু

ভুলে গেল। বললে, খুন-টুন যারা করে, মানুষ তারা খুব খারাপ হয় না। চোর-ছ্যাঁচড়গুলোই খারাপ হয় বেশি।

এই বলে সুরবালা তার নিজের রসিকতায় নিজেই একবার হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু খুনের প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল তার অতীত জীবনের কথা।

—এই আন্দামান দ্বীপটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না মা, কিন্তু এমনি কপাল—আবার ঘুরে ফিরে এইখানেই আসতে হলো !

শীলা বললে, কেন ? জায়গাটা তো ভালো !

—বাপের যদি টাকা থাকে, আর ফুর্ত্তি করে কেউ যদি জীবনটাকে ফুঁকে দিতে চায়, তাহ'লে ভাল। নেশাভাং আছে, নানান জাতের ছুঁড়ি ছুঁড়ি মেয়ে আছে।

ভদ্রমহিলার মুখের বাঁধন নেই। শীলা বললে, আজ চলি। আর একদিন শুনবো।

শীলা সত্যিই চলে গেল। সারাদিনের মধ্যে এদিকে তার আর আসবার প্রয়োজন হলো না। হাটুতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে দেখে কি একটা ইঞ্জেক্‌সান্‌ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হলো।

চন্দনের কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছিল না শীলা। সমস্ত দোষ তারই ওপর চড়িয়ে দিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত মনে সরে পড়লো সে !

সত্যিই কি সে তাকে পরীক্ষা করছিল ?

হাঁসপাতাল থেকে ফিরে গিয়েই মিনতিকে সব কথা সে জানালে। বললে, তাকে একদিন এখানে আসতে বলেছি দিদি।

মিনতি বললে, আসুক। আমি একবার দেখবো সে ওস্তাদকে।

বাইরে মোটরবাইকের আওয়াজ শুনে শীলা বলে উঠলো, ওই বুঝি এলো !

তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে ছুটে গিয়ে শীলা দেখলে সুন্দরম একা নামছে বাইক থেকে।

মিনতি বললে, ভাস্থুরের খবর কি? বোনের জন্যে মন কেমন করছে!

সুন্দরম বললে, এক মাস তো হয়ে গেল দিদি এবার তাকে ছেড়ে দিন।

—মিনতি বললে, এক মাস বলেছিলাম নাকি!

—হাঁ-হাঁ।

—তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে!

—তা হচ্ছে।

—তাহ'লে আরও কিছুদিন কষ্ট কর।

সুন্দরম কি সংবাদ নিয়ে এসেছে জানবার জন্য শীলা একটু উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞাসা করলে, মংলুটনে গিয়েছিলে!

সুন্দরম বললে, সেইখান থেকেই তো আসছি।

—খবর কিছু পেলে।

সুন্দরম ভাল করে চেপে বসলো। বললে, বিশু কি বাড়ী থেকে রাগ করে পালিয়ে এসেছে!

শীলা বললে, নাঃ, ঠিক রাগ করে এসেছে বলা চলে না।

—জরুর বলা চলে। যেই শুনেছে আমি ওর খোঁজ করতে গেছি, অমনি বসে রইলো ঘরের ভেতর, কিছুতেই বেরুতে চায় না।

—তারপর। শীলা বললে, বিশুই ঠিক তো।

—হাঁ হাঁ বিশু। এখানে বলেছে আমার নাম আছে বিশ্বেশ্বর। চেহারা তো চিনি না, কাল আমি অমরনাথবাবুকে নিয়ে যাব।

শীলা বললে, তাই যেয়ো। কেমন দেখতে বল তো।

—ঠিক তোমরা যেমনটি বলেছিলে। বড় বড় চুল, গায়ের রং ফর্সা, গাঁট্টা গোট্টা জোয়ান।

সুন্দরম বললে, কাল আমি ধরে নিয়ে আসছি ছাখোই না।

মিনতি হাসতে হাসতে বললে, তোমার মত অনুগত ভক্তরা আছে বলেই আমাদের মত মেয়েরা এখনও জীবন ধারণ করে আছে বুঝলে ভাসুর? নইলে কবে আমরা দেহত্যাগ করে দিতাম।

সুন্দরমও হাসতে হাসতে বললে, আপনি সব সময় আমাকে ঠাট্টা করেন।

—ঠাট্টা আর কার সঙ্গে করবো ভাসুর? এই পাণ্ডববর্জিত দ্বীপে ঠাট্টা করবার মত মানুষ কোথায়? তবে এই আমি বলে রাখলাম শীলা, তুই সাক্ষী রইলি, তোর ভাইকে যদি ও খুঁজে এনে দিতে পারে তো এই মাসের ভেতর ভাল একটি বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেবো।

শীলা বললে, জামাইবাবু খুব ভাল একটি উদ্বাস্তু মেয়ে দেখেছে দিদি, কিন্তু ও বলছে বিয়ে করবে না।

—করে না করে সে আমি দেখে নেবো। আর একটি কথা শোনো ভাসুর, সেই যে-ছোকরাটিকে তুমি শীলার হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে, সে কোথায় থাকে তুমি জানো?

সুন্দরম বললে, না। বাড়ীটা দেখতে চাইলাম, দেখালে না।

মিনতি বললে, এবার যদি কোনোদিন পথে-ঘাটে দেখতে পাও তো জোর করে তোমার ওই হাওয়াগাড়ীতে তুলে নিয়ে সোজা আমার কাছে নিয়ে এসো।

—যে-আজ্ঞে।

কথাটা সুন্দরম বোধকরি রসিকতা করেই বললে। বলেই হাসতে হাসতে নীচে নেমে গিয়ে তার মোটরবাইকে ষ্টার্ট দিলে।

হাঁসপাতালে শীলার সঙ্গে যে-সব মেয়ে কাজ করে তারা সবাই যেন অন্য চোখে দেখে শীলাকে।

তার যেন সাত খুন মাপ!

হাঁসপাতালের কাজে যখন খুশী আসে, যখন খুশী যায়, কেউ কিছু বলে না।—হে ভগবান, আসছে জন্মে যেন অমনি সুন্দরী হয়ে জন্মাতে পারি।

সুরবালার সেদিন কেমন যেন হাসি-হাসি মুখ। পায়ের ফুলোটা অনেক কমে গেছে। যন্ত্রণাও কম।

শীলাকে দেখেই বলে উঠলো, বলি ওগো মেয়ে, বুড়ীর দিকে একবার ফিরে তাকাও! কাল না হয় দুটো খারাপ কথাই মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে!

শীলা বোধহয় একটু লজ্জা পেলে।—ছি ছি আপনি কি ভাবছেন আমি সেই জন্যে আসিনি?

—তা নয় তো কী?

শীলা বললে, বাড়ীতে আমার একটু দরকার ছিল। আজ আমি কাজে এসেছি অনেক দেরিতে।

সুরবালা বললে, তাই তো বলি! বাসুদেব এসেছিল আমাকে একটা খবর দিতে। তোমার জন্যে বসে বসে চলে গেল।

—বাসুদেব এসেছিল?

—হ্যাঁ মা এসেছিল। আমার ছেলের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। বলেছে এখানে আসতে তো আসেনি। মা যে এখানে মরে যাচ্ছে, তাতে তার দুঃখু নেই। এই তো পেটের ছেলে!

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?

ম্লান একটু হেসে সুরবালা বললে, কোথায় পাবো মা, ওই একটি। ছেলে যখন পাঁচ বছরের তখন ওর বাপ গেল মরে। তখনই ভেবে-ছিলাম, আর কী সুখে থাকবো এখানে? ছেলেকে নিয়ে পালাই কলকাতায়—যে যা বলে বলুক্! কিন্তু যাব কেমন করে? যুদ্ধু চলছে তখন। ইংরেজ গেল, জাপানী এলো। সে কী কষ্ট রে বাবা! কপালে মরণ নেই তাই বেঁচে রইলাম। যুদ্ধু থামলো তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেকে নিয়ে চলে গেলাম কলকাতায়। কিন্তু

ছেলের গায়ে বাপের রক্ত, তার ওপর জন্ম এই আন্দামানের মাটিতে। সেই মাটির ওপর কী যে টান ছেলের, দু' দু'বার পালিয়ে এলো আর দু'বারই আমি টেনে টেনে নিয়ে গেলাম। তখন বললাম—চল্ বাবা তাহ'লে সেইখানেই যাই। এখন তো বড় হয়েছিস, চাকরি-বাকরি করে খাওয়াতে পারবি না বুড়ি মাকে? বললে, পারব। তারপর বাস্, মাকে কলকাতায় ফেলে রেখে, ছেলে একদিন উধাও! সেই হতভাগা ছেলের টানে টানে আজ বারো তেরো বছর পরে আবার এলাম এই হতচ্ছাড়া আন্দামানে। তা' ছেলের গুণ ছাখো না! মাকে একবার দেখতে পর্যন্ত এলো না?

মনের আবেগে বুড়ী তার কথাগুলো বলতে বলতে ঘন-ঘন তাকাচ্ছিল শীলার সিঁথির দিকে। হঠাৎ বলে বসলো, সিঁদুর দেখছি না তো! বিয়ে করনি এখনও?

—শীলা বললে, না।

—থাকতে যদি পার তো কোরো না। ঠিক মানুষটি যদি কপালে না জোটে তো মাঝ-দরিয়ায় হাবুডুবু খাবে।

এই বলে একটু হেসে শীলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সুরবালা বললে, যাও মা এবার তোমার কাজে যাও। অনেকক্ষণ ধরে রেখেছি তোমাকে। বুড়ো মানুষ—একটু বক্‌বক্ করতে ভাল-বাসি।

বিকেলে সেদিন একটু সকাল-সকাল পালাবে ভেবেছিল শীলা। জামাইবাবুকে নিয়ে সুন্দরম যাবে মংলুটনে, বিশু বলে সুন্দরম আবার কা'কে ধরেছে কে জানে। খবরটা পাবার জন্যে শীলার মন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সেদিন।

শীলা বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় সুরবালা ডাকলে, শোনো!

কাছে যেতেই সুরবালা বললে, তোমাকে একটি কথা বলবো মা, তুমি রাখবে?

—কি কথা বলুন!

—তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো ?

এ আবার কি রকম প্রশ্ন ? বুড়িটা কি পাগল হয়ে গেল নাকি ? শীলা তার মুখের দিকে তাকালে।—কেন বলুন তো ?

—সায়েবদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে ? লেখাপড়া নিশ্চয়ই শিখেছ ?

—শিখেছি। বলুন কি করতে হবে।

সুরবালা বললে, এখানে একটা 'ডক্' আছে জানো ?

—জানি। এই তো কাছেই।

—সেই ডকে কাজ করতো আমার স্বামী। সেইখানে কাজ করতে করতেই আমার স্বামী মারা যায়। হ্যাটন্ সায়েব ছিল হারবার-মাষ্টার। সায়েব বলেছিল, তোমার ছেলে বড় হোক্, তখন তাকে ভাল একটা চাকরি করে দেবো। সেই হ্যাটন্ সায়েবের সঙ্গে তোমাকে একবার দেখা করতে হবে।

এই বলে শীলার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে সুরবালা বললে, তোমার দুটি হাতে ধরে বলছি মা, আমার এই কথাটি তোমাকে রাখতেই হবে।

শীলা সত্যিই ভারি বিপদে পড়লো। বললে, আপনার ছেলের চাকরির কথা আপনারই বলা উচিত।

সুরবালা বললে, আমিই তো বলবো। তুমি শুধু সায়েবকে এইখানে ডেকে আনবে। বলবে, সুরবালা এসেছে আন্দামানে। বড় হাঁসপাতালের কুড়ি নম্বর বেডে রয়েছে। তুমি একবার দেখা করবে, এসো।

শীলাকে সম্মতি দিতেই হলো। বললে, আপনার স্বামীর নাম বলুন। সুরবালা বললে সায়েব হয়ত চিনতেই পারবে না।

মাথা নীচু করে কথা বলছিল শীলা। হঠাৎ হাসি শুনে যেন চম্‌কে উঠলো। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে, সুরবালা হাসছে।

সে এক অদ্ভুত হাসি। বড় বড় চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে। মুখখানা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হাসি থামিয়ে বললে, স্বামীর নামটা হয়ত বা সে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু হ্যাটন্ সায়েব সুরবালাকে ভুলবে না।

শীলা তখনও ইতস্তত করছিল। বললে, বাসুদেবকে পাঠালে হতো না?

—দূর বোকা মেয়ে!

সুরবালা হাত দিয়ে শীলার মুখখানি তুলে ধরে বললে, এই সুন্দর মুখখানির কত দাম আমার কথা শুনে একবার তুই পরীক্ষা করে' ছ্যাখ! হ্যাটন সায়েব এতদিনে হয়ত' আমারই মতন বুড়ো হয়ে গেছে, তবু আমি বলছি, বিশ্বাস না হয় তো দেখো—তোমারই সঙ্গে চলে আসবে এই হাঁসপাতালে।

এর ওপর আর কথা চলে না।

শীলা বললে, আচ্ছা যাব।

মংলুটন থেকে ফিরে এসেছে সুন্দরম। বাইকের পেছনে এবার সে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অমরনাথকে।

এবার সে ধরেছিল গিয়ে কোন্ এক বিশ্বেশ্বর বোসকে।

সুন্দরম বললে, আমার কি দোষ বহেন? বাঙ্গালী ছোকরা, কলকাতা থেকে রাগ করে এসে চাকরি করছে ফরেষ্টে, নাম বললে, বিশু বোস, বামুনের ছেলে—

মিনতি বললে, তোমার মুণ্ডু! বোস কখনও বামুন হয় না।

—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সুন্দরম সত্যিই সুন্দর। সারা জীবন ধরে যা-কিছু করলে সবই সুন্দর।

শীলা বললে, দিদি, কাল থেকে আমি দেখবো। বিশুকে এরা কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না।

মিনতি বললে, তোর চাকরির কি হবে ?

—চুলোয় যাক্ আমার চাকরি।

মিনতি বললে, তা না হয় যাক্, কিন্তু তুই কি ভেবেছিস—পোর্ট ব্লেয়ারের পথে পথে ঘুরে বেড়াবার জন্যে তোকে আমি একা-একা ছেড়ে দেবো ?

সুন্দরম বললে, আমি রয়েছি কি জন্যে ?

—সত্যিই তো! মিনতি বললে, তোর এই বাহনটির কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কাল থেকে তোমার নতুন উপাধি হলো—বহিন-বাহন।

বহিন-বাহন পরের দিন সকালেই বাইক্ নিয়ে এসে হাজির!

মিনতির অনুমতি নিয়ে শীলা গিয়ে বসলো বাইকের পেছনে। বললে, আস্তে আস্তে চালাও। আমি দেখতে দেখতে যাব।

সুন্দরম বললে, ডক্-ইয়ার্ডটা একবার দেখে যাবে ?

ডকের কথা বলতেই শীলার মনে পড়লো সুরবালার কথা। তাকে সে কথা দিয়ে এসেছে।

শীলা বললে, এইখানে দাঁড়াও, আমি নামবো।

হারবার-মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করতে চায় মিস্ শীলা চক্রবর্ত্তি।

মোটরবাইক্ থেকে নেমেছে অমন সুন্দরী মেয়ে, ভিজিটিং কার্ডের দরকার হলো না, বেয়ারা নিয়ে গেল আপিস-ঘরের ভেতরে।

সাহেবী পোষাক পরে যিনি বসেছিলেন চেয়ারে, তাঁকে ঠিক সাহেব বলে মনে হলো না শীলার। তবু জিজ্ঞাসা করলে, আপনি মিষ্টার হ্যাটন্ ?

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন শীলার মুখের দিকে! বললেন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? আপনি বসুন।

শীলা বসলো। বললে, আপনিই কি মিষ্টার হ্যাটন্ ?

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে না, আমার নাম পি, এন, আয়ার।

হ্যাটন্ বলে তো কেউ এখানে নেই ! আপনি বাঙ্গালী ?

শীলা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। বললেন, এঁকে মিষ্টার ব্যানার্জির ঘরে নিয়ে যাও।

শীলাকে বললেন, আমাদের মেরিণ ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার পি, ব্যানার্জি বাঙ্গালী। তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

শীলা উঠে দাঁড়ালো। একবার ভাবলে, দরকার নেই পি, ব্যানার্জির ঘরে গিয়ে ! সেখানেও গিয়ে হয়ত' শুনবে—মিষ্টার হ্যাটন্ বলে কেউ নেই এখানে। সেই কথাই সুরবালাকে জানিয়ে দিলেই হবে।

বেরিয়েই যাচ্ছিল শীলা, এমন সময় বেয়ারা ডাকলে, ওদিকে নয়, এইদিকে।

শীলা ভাবলে, হ্যাটনের কথা না জিজ্ঞাসা করে বরং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি নামে কোনও বাঙ্গালীর ছেলে এখানে কাজ করে কিনা জেনে নেওয়া ভাল। বেয়ারার পিছু পিছু শীলা আর-একটা আপিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার পি, ব্যানার্জি কি যেন লিখছিলেন। বেয়ারার কথা শুনে মুখ তুলে তাকালেন। তাকিয়ে কিন্তু আর চোখ নামাতে পারলেন না।

এদিকে শীলার অবস্থাও ঠিক তাই।

বেয়ারা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটা ক্লকের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে শীলা বসলো সুমুখের চেয়ারে। বললে, আমি হ্যাটন সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—হ্যাটন্ সায়েব !

ঘণ্টা বাজিয়ে তিনি তাঁর বেয়ারাকে ডাকলেন। বললেন, আমি নতুন এসেছি এখানে।

বৃদ্ধ একজন বেয়ারা এসে সেলাম করলে।

ব্যানার্জি-সাহেব বললেন, এঁকে হ্যাটন্ সায়েবের কাছে, নিয়ে যাও।

—কি সায়েব বললেন হুজুর ?

শীলার দিকে তাকিয়ে ব্যানার্জি-সাহেব বললেন, বলুন !

শীলা বেয়ারাকে বললে, মিষ্টার হ্যাটন।

বুড়ো বেয়ারা অনেকদিনের লোক। বললেন, হ্যাটনকে এখন আর কোথায় পাবেন হুজুর, ইংরেজ-আমলে তিনি ছিলেন এইখানে। তারপর জাপানী এলো। তখনও লুকিয়ে লুকিয়ে থাকলেন। তার-পর আর তাঁর কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। কেউ বললে, পালিয়েছে। কেউ বললে, মরে গেছে।

ব্যানার্জি-সাহেব বেয়ারাকে সরিয়ে দিয়ে শীলার দিকে তাকালেন।—কী দরকার আপনার হ্যাটন্ সায়েবের সঙ্গে ?

শীলা বললে, আমার কোনও দরকার নেই। এক বুড়ী বাতে পঙ্গু হয়ে হাঁসপাতালে পড়ে আছে। সেই আমাকে অনুরোধ করেছে হ্যাটন সাহেবকে একটা কথা জানাতে।

—কি কথা ?

—তার ছেলেকে হ্যাটন সাহেব বলেছিলেন একটি চাকরি দেবেন।

—ছেলেটা কিরকম ? কতদূর লেখাপড়া শিখেছে ?

—কিছুই জানি না।

—আচ্ছা ধরুন, চাকরি সে পাবে।

—পাবে ? শীলার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, তাহ'লে তার মাকে আমি এই কথা জানিয়ে দেবো ?

ব্যানার্জি সাহেব বললেন, দিতে পারেন।

শীলা বললে, আর একটা কথা তাহ'লে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি নামে কোনও ছেলে কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে আপনার এখানে কোনও কাজ টাজ করছে ?

হাতে কলম ছিল ব্যানার্জি সাহেবের। একটা কাগজে নামটা লিখতে লিখতে বললেন, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি। খবর নিয়ে আপনাকে জানাবো। কোথায় জানাব বলুন।

শীলা বললে, এখানকার মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার ভাদুড়ীর কোয়ার্টারে। না থাক, আমি নিজেই আসব।

ব্যানার্জি-সাহেব এইবার মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে ভাল করে নড়েচড়ে বসলেন। শীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাস্, এইবার বলুন আপনি কখন এলেন এখানে? বাবাঃ! বুকের ভেতরটা এতক্ষণ তোলপাড় করছিল—কোথায় দেখেছি কোথায় দেখেছি অথচ এত বেশি চেনা-চেনা হচ্ছে এই মুখখানা—

বলতে বলতে হো হো করে হেসে উঠলেন পোর্ট ব্লেয়ারের মেরিণ ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার পি, ব্যানার্জি। অর্থাৎ অমরনাথের ছাত্র সেই প্রিয়দর্শন পরিতোষ—'সি সিক্‌নেসে'র ওষুধ আনতে গিয়ে চা খেতে খেতে শীলার সঙ্গে যার প্রথম পরিচয়।

শীলাও হাসতে লাগল। বললে, আমি কিন্তু ঘরে ঢুকেই আপনাকে চিনতে পেরেছি।

পরিতোষ বললে, আমি ওষুধ নিয়ে চলে এলাম, কিন্তু এই মুখ-খানা আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রইলো।

শীলা বললে, তার পর অনেক মুখ এসে সে-মুখটাকে চাপা দিয়ে দিলে। তাই এতক্ষণ খুঁজেও পাচ্ছিলেন না—বুঝতেও পারছিলেন না কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সে জঞ্জালটাকে।

—না না তা নয়। একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে হাসতে হাসতে পরিতোষ বললে, এই অথৈ সমুদ্রের অগাধ জলে ভাসতে ভাসতে সে-মুখ যে এই জংলী দ্বীপের উপকূলে এসে লাগবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।

শীলা বললে, আর আপনি যখন আমার সঙ্গে দেখা না করেই পালিয়ে গেলেন তখন ভাবলাম বুঝি—

—কি ভাবলে ?

—না থাক্। বলুন আপনার কোয়ার্টার কোথায় ?

—ওই তো, এখান থেকে দেখা যায়—

পেছনে জানলার ভেতর দিয়ে উঁচু টিলার ওপর নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে লতায় আর ফুলে ঢাকা কাঠের যে দোতলা বাংলো-বাড়ীটি দেখা যাচ্ছিল, সেইটি দেখিয়ে দিয়ে পরিতোষ বললে, ওই বাড়ী।

—কে আছে বাড়ীতে ?

—আমি একা।

—একা কেন ?

পরিতোষ বললে, তপস্যা না করলে তো আর-একজনকে পাওয়া যায় না!

শীলা বললে, করুন তপস্যা!

পরিতোষ বললে, প্রতিজ্ঞা করেছি—

'আমি হব না হব না হব না তাপস
যদি না পাই তপস্বিনী!'

দু'জনের স্নিগ্ধ হাসিতে মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারের আপিস-ঘর সেদিন মুখরিত হয়ে উঠলো।

হাঁসপাতালে যাওয়া বন্ধ হ'লে কি হবে, শীলার এখন অনেক কাজ।

ডক্-ইয়ার্ডের লেবার লিষ্টে বিশুর নাম কোথাও পাওয়া যায়নি। কাজেই সুন্দরমের বাইকের পেছনে চড়ে দিনান্তে একবার তাকে পোর্ট ব্লেয়ার পরিক্রমা করতেই হয়।

তার ওপর আছে পরিতোষ। আছে মিনতি দিদি।

পরিতোষকে অমরনাথের কাছে ধরে এনে শীলা সেদিন বললে, ছাখো কা'কে ধরে এনেছি।

পরিতোষকে দেখে অমরনাথ যেন নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, এতদিন পরে আন্দামান আসা আমার সার্থক হলো।

শীলা ধরে বসলো, এ-কথা কেন বললে, বল তুমি!

পরিতোষের কাছে অমরনাথ সেকথার কোনও জবাব দিলেন না। রসিকতা করে বললেন শুধু ঃ রাই ধৈর্য্যম্।

পরে অবশ্য এর জবাব একদিন দিলেন তিনি। বেশি দিন পরে নয়। দিন চার-পাঁচ পরে যেদিন রাত প্রায় বারোটার সময় পরিতোষ নিজে এসে শীলাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল—সেইদিন।

দোর অবশ্য খুলে দিয়েছিল সুন্দরম। তার রাগও নেই, অভিমানও নেই। শীলা হাসছে, হেসে কথা বলছে—এইতেই সে খুশী।

অমরনাথ যাতে জানতে না পারে তাই পা টিপে টিপে সোজা বাথরুম থেকে কাপড়-জামা বদলে একেবারে খাবার টেবিলে গিয়ে বসেছিল শীলা। আপন মনেই গুন্ গুন্ করে কিসের যেন একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে টুকরো টুকরো খাবার মুখে তুলছে, এমন সময় পিপাসার্ত্ত অমরনাথের এক গ্লাসের জলের বড় বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়লো। খালি পায়েই উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়াতে গড়াতে বললে, পরিতোষ যে এখনও কিছু বলছে না শীলা?

—কি বলবে?

—বলবে, মানে প্রার্থনা করবে।

—কি প্রার্থনা করবে?

—শীলা দেবীর পাণি প্রার্থনা করবে। পাণি মানে জল নয়।

—ধেৎ। জানি না।

অমরনাথ বললেন, কেন আর ছলনা করছ দেবী, জানো সবই। একটুখানি তাড়াতাড়ি করতে বল। আমিও নিশ্চিন্ত হই, তুমিও নিশ্চিন্ত হও।

শীলা বললে, দাঁড়াও আগে বিশুকে খুঁজে বের করি। তার পর।

এর ওপর আর কথা চলে না।

শীলা আবার বললে, আমাকে চোখের বার করতে পারলে তুমি তো বাঁচো। কিন্তু এই পোর্ট ব্লেয়ারেই বিশু থাকবে কোথায় লুকিয়ে, আর আমি এই পোর্ট ব্লেয়ারেই বিয়ে করবো—সত্যি বলছি ভাল লাগছে না জামাইবাবু। আমি দিবারাত্রি প্রার্থনা করছি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হলে কবে থেকে?

শীলা বললে, কলকাতার বাড়ীর বাইরের ঘরে সেই যে ছবিখানা তুমি এনে রেখেছিলে—

অমরনাথ আর কোনও কথা বললেন না। যুক্তকরে একটি প্রণাম করলেন শুধু।

•

পরের দিন বেলা তখন প্রায় চারটে।

সুন্দরমের মোটরবাইকের পেছনে বসে শীলা সেদিন অনেকখানা পথ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে বললে, চল এবার বাড়ী যাই। হতভাগা সারাদিন বাড়ীতেই বসে থাকে, রাস্তায় বেরোয় না—নাকি?

পথের ধারে সুন্দরমের রেষ্টুরেন্ট। হঠাৎ মনে হলো যেন রেষ্টুরেণ্টের ভেতরে খুব জোর একটা চেঁচামেচি গোলমাল চলছে।

বাইক থামিয়ে সুন্দরম বললে, তুমি একটু বোসো গাড়ীতে, আমি চট্ করে দেখে আসি।

সুন্দরম গিয়ে দেখলে একজন খরিদ্দারের সঙ্গে রেষ্টুরেণ্টের একজন রাঁধুনীর হাতাহাতি মারামারি হবার উপক্রম। খরিদ্দার এক প্লেট হরিণের মাংস নিয়ে খেতে বসেছিল। কম বয়েসী সুন্দর একটি ছেলে। মাংসটা মুখে দিয়েই সে চেঁচিয়ে ডেকেছে রাঁধুনীকে। অসম্ভব ঝাল। রান্নাও ভাল হয়নি। রাঁধুনী বলেছে, রান্না সব

দিন সমান হয় না। ছেলেটি বলেছে, তাহ'লে পয়সাটাই-বা সবদিন সমান নেবে কেন? এই নিয়ে দু'চার কথা বলাকওয়া হতে হতে রাগ করে সেই প্লেটসমেত মাংসের ঝোল ছেলেটি ছুঁড়ে দিয়েছে রাঁধুনীর গায়ে।

সুন্দরমকে ঢুকতে দেখে রাঁধুনী থেমে গেছে, কিন্তু ছেলেটি থামেনি।

সুন্দরম বললে, ওঁর পয়সা ওঁকে ফেরত দাও।

বলেই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো রেষ্টুরেন্ট থেকে। শীলা অপেক্ষা করছে গাড়ীতে, তার দাঁড়াবার সময় নেই।

কিন্তু মালিক সরে যেতেই রাঁধুনী আবার নিজের মূর্তি ধরেছে।—পয়সা ফেরত পাবে না। এই যে আমার কাপড় নষ্ট হলো এর দাম দেবে কে?

ছেলেটি বাইরে বেরিয়ে এসে হাত তুলে ডাকলে শুনছেন?

রাস্তার এপারে সুন্দরম সবে তখন গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে যাচ্ছে, ডাক শুনে শীলা মুখ ফেরাতেই ছেলেটি চীৎকার করে উঠলো, ছোট্দি।

শীলা নেমে পড়লো গাড়ী থেকে।—বিশু!

রেষ্টুরেণ্ট, মাংস, পয়সা, সব কিছু ভুলে গিয়ে বিশু ছুটতে ছুটতে গাড়ীর কাছে এসে বললে, তুই এখানে এলি কেমন করে ছোটদি?

শীলার মুখ দিয়ে তখন আর কথা বেরুচ্ছে না, চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে। শুধু বললে, খুব ছেলে বাবা! চল!

সুন্দরম সেই গাড়ীতে বসিয়েই তাদের নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, শীলা বললে, ওই তো একটা ট্যাক্সি রয়েছে, ওইটে ধরে আমরা চলে যাচ্ছি। তুমি বরং কয়েকটা টাকা থাকে তো আমাকে দাও।

সুন্দরম তার পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে শীলার সামনে ধরে দিয়ে বললে, যা দরকার, তুলে নাও বহেন।

শীলা আজ তার কাছ থেকে টাকা চেয়েছে, তাইতেই সে কৃতার্থ হয়ে গেছে।

পাঁচ টাকার একখানি নোট তুলে নিয়ে শীলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, পাগল!

—না বহেন, অনেক কষ্টে আজ বিশুকে পাওয়া গেছে। আজ আমরা সেলিব্রেট্ করবো। তোমরা তাড়াতাড়ি এসো।

শীলা বললে, আমি পরিতোষবাবু আর মিনতিদিকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ততক্ষণ জামাইবাবুকে খবর দাও।

রেষ্টুরেন্ট থেকে একটা লোক ছুটে এসেছিল বিশুর হাতে পয়সা ফেরত দিতে। বিশু ধমক দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলে।—ভাগ্! ও পয়সা তোরা খেগে যা।

গাড়ীতে উঠে সারারাস্তা বিশু কত কথাই না বলতে লাগলো।—জামাইবাবুও চলে এসেছে?

তাহ'লে কলকাতার বাড়ীতে কে রইলো?

শীলা বললে, অন্য লোককে ভাড়া দিয়ে আসতে হয়েছে।

—পাঁচু কি করছে? চাকরি ছেড়ে দিয়েছে?

—না। পাঁচু ওই বাড়ীতেই আছে।

—আমি একটা চাকরি পেয়েছি ছোটদি। ম্যাজিষ্ট্রেট হরিসাধনবাবুর বাড়ীতে। খুব শীগ্গির আদালতে একটা কাজ করে দেবেন বলেছেন। আমার মাইনের সব টাকাটা তোর হাতে আমি এনে দেবো, তার ওপর তুই যদি এখানে একটা কাজকর্ম জোগাড় করে নিতে পারিস, তাহ'লে আমাদের এইখানেই থাকা চলে। অমরদাকে তুই যদি একবার বলিস ছোটদি, তাহ'লেই হয়।

শীলা জিজ্ঞাসা করলে, তোর খুব ভাল লেগেছে এই জায়গাটা?

—হ্যাঁ ছোটদি। হরিসাধনবাবু মস্ত বড় ম্যাজিষ্ট্রেট ছোটদি, আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি বলবো—আমার ছোটদি এসেছে,

আই-এ পাশ, তার ওপর মেডিক্যাল কলেজে পড়েছে, ওর একটা চাকরি করে দিন। ঠিক করে দেবেন—তুই দেখে নিস্।

মেরিন ইয়ার্ডের পাশে গাড়ী দাঁড়ালো। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে গাড়ীটা ছেড়ে দিলে শীলা।

পরিতোষ একাই বসেছিল তার আপিস-ঘরে।

বিশুকে নিয়ে শীলা ঢুকলো।

—এই ছাখো আমার ভাইকে পেয়ে গেছি। কাজ শেষ হয়ে থাকে তো ওঠো। এক্ষুনি যেতে হবে মিনতিদির বাড়ী। তারপর মিনতিদিকে সঙ্গে নিয়ে জামাইবাবুর কাছে। আজই বলতে হবে তোমাকে।

পরিতোষ বেয়ারাকে ডেকে বললে, আমার গাড়ীটা আনতে বল।

তিনজনে আপিস থেকে যেই বেরিয়েছে, শীলা দেখলে, হাঁস-পাতালের সেই বৃদ্ধা সুরবালা একটা লাঠি ধরে সেইদিকেই এগিয়ে আসছে। বেচারা নিজেই এসেছে হ্যাটন-সাহেবের খোঁজে।

ছি ছি, খবরটা অন্তত তাকে দিয়ে আসা উচিত ছিল শীলার। পরিতোষকে পেয়ে সব কিছু ভুলে বসে আছে সে।

শীলা নিজেই একটু এগিয়ে গেল সুরবালার কাছে।

—দেখুন, হ্যাটন সায়েবের খবর এখানে কেউ কিছু দিতে পারে না। তিনি এখানে নেই।

সুরবালা বললে, অনেকদিন হয়ে গেল। না থাকবারই কথা। কিন্তু এত করে তোমাকে হাতে ধরে বললাম, খবরটা একবার দিয়ে যদি আসতে মা, আমাকে আর কষ্ট করে এখানে আসতে হতো না।

শীলা বললে, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। সেদিন থেকে হাঁসপাতালে আমি যেতেও পারিনি।

—এইখানেই জমে গেছ, বুঝতে পারছি।

সুরবালা এদিকে ওদিক তাকিয়ে দেখছিল—যেন এ-সবই তার

চেনা। একটা বাড়ীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, এইটে ছিল হ্যাটন্ সাহেবের আপিস।

সব-কিছু বদলে গেছে।

মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারের গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি তাকে যেতে হবে। সুরবালার সঙ্গে কথাটা তার শেষ করে নেওয়া দরকার।

শীলা বললে, দেখুন, ওই যে ছেলেটির হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উনিই এখানকার মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। আমি আপনার ছেলের কথা ওঁকে বলেছি। উনি বলেছেন আপনার ছেলের একটা চাকরি এখানে করে দেবেন।

সুরবালা খুব খুশী হলো খবরটা শুনে। ডান হাতে লাঠি, কাজেই বাঁ হাতটা বাড়িয়েই শীলার একখানা হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে, লক্ষ্মী মা আমার!

এই বলে সে এগিয়ে গেল পরিতোষের দিকে।

—মেয়ের মুখে সবই তো শুনেছেন বাবা, নতুন করে আর কী বলবো?

কথাটা তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে পরিতোষ বললে, আপনার ছেলেকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন এই আপিসে।

—বলবো বাবা। কিন্তু আমার তো এই অবস্থা, সঙ্গে যদি না আসতে পারি বাবা, ছেলেকে আপনি চিনবেন কেমন করে?

পরিতোষ বললে, ছেলের নাম বলুন।

সুরবালা বললে, আমার ছেলের নাম চন্দন। চন্দন চ্যাটার্জি।

নামটা শীলা শুনলে।

সুরবালা তখনও বলে চলেছে, ছেলে আমার খুব চালাক চতুর বাবা। লেখাপড়া বেশি শেখেনি কিন্তু ইংরেজিতে ফড় ফড় করে কথা বলতে পারে। একেবারে সায়েবের মতন দেখতে—

—ঠিক আছে। মনে থাকবে।

গাড়ীর দরজাটা খুলে বিশুকে আর শীলাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে বসলো পরিতোষ। ড্রাইভারকে বললে, চালাও।

শীলার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছো ?

শীলা বললে, কিছু না।

বলেই সে পরিতোষের হাতখানা দুহাত দিয়ে ভাল করে চেপে ধরল।

শেষ